যুদ্ধ কোন পথে?

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

পঞ্চম সংস্করণের নিবেদন

দ্বিতীয় মহাসমর সবেমাত্র শেষ হ'ল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আণবিক বোমার দ্বারা জাপানের পতন ঘটিয়েছে। আণবিক বোমার গঠন ও প্রয়োগ প্রণালী সম্বন্ধে গবেষণা অনেক কাল পর্য্যন্ত চলেছে, তবে মার্কিন বৈজ্ঞানিকেরাই সর্ব্বপ্রথম একে কার্য্যকরী করতে সক্ষম হয়েছে। এ বিষয়টি অন্য কোন দেশ এখনও জান্‌তে পারে নি। মিত্রশক্তিদের, এমনকি ব্রিটেনকেও এ বিষয় জান্‌তে দেওয়া হয় নি। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে গবেষণা-রত বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন যে, পদার্থের পরমাণুর মধ্যেকার কথা বৈজ্ঞানিকরা আগেই বলে গেছেন। পরমাণুকে ভাঙতে পারলে এই শক্তির কিয়দংশ বা'র হয়ে আসে। কিন্তু এক পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রীয় বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে অপর পদার্থের কেন্দ্রীয় বস্তুতে রূপান্তরিত করবার সময় যে শক্তির উদ্ভব হয় তার প্রচণ্ডতা অসাধারণ। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক হান ও ষ্ট্রাসম্যান মন্দগতি নিউট্রন কণিকার সংঘাতে ইউরেনিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীয় পদার্থকে দ্বিধা বিভক্ত করে প্রচণ্ড শক্তি বা'র করতে সমর্থ হন। ইউরেনিয়াম পরমাণু থেকে উদ্ভূত প্রচণ্ড শক্তি সাহায্যেই এটম বোমা অভাবনীয় ধ্বংস কার্য্য করে থাকে। এই শক্তি সমপরিমাণ উগ্রবিস্ফোরক পদার্থের শক্তি অপেক্ষা প্রায় দশকোটি গুণ অধিক। এই বোমা পতনের ফলে হিরোশিমা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ায় এর ধ্বংস-শক্তি কতকটা বুঝা যায়। এখানে যে বোমা ফেলা হয় তার ওজন ছিল পাঁচ পাউণ্ড যা প্রায় ছয় মণ। সাধারণ বোমার ওজন কিন্তু একশ' দেড় শ' মণও হয়ে থাকে। এইরূপ ধ্বংসকারী বোমার প্রয়োগের বিরুদ্ধে কিন্তু বিজিত

বিজেতা "সব দেশেই প্রতিবাদ হচ্ছে। এরূপ বোমার প্রয়োগ হতে থাকলে মানব সভ্যতার শেষ চিহ্নটুকুও লুপ্ত হয়ে যাবে।

এবারেও পুস্তকখানি যথারীতি সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করা হয়েছে। যতটা সম্ভব আধুনিকতম ঘটনা পর্য্যন্ত এতে দিতে চেষ্টা করেছি। লর্ড ওয়াভেল সম্প্রতি বিলাতে গিয়েছেন। এবারেও ভারতবর্ষ সম্পর্কে কোন সুষ্ঠু নীতি অবলম্বিত হয় কিনা বলা কঠিন। পাঠক-পাঠিকা যেরূপ সাগ্রহে বইখানি গ্রহণ করেছেন তাতে তাঁদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি। এবারেও ছবিগুলি 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' হতে নেওয়া।

কলিকাতা
৩০শে ভাদ্র, ১৩৫২ সাল

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

আজকের দিনে মানুষ শত চেষ্টা করলেও অন্য থেকে আলাদা হয়ে থাক্‌তে পারবে না। জগতের এক দেশের সমস্যা অন্য দেশকে ভাবিত করেই তুল্‌ছে অবিরত। ভারতবর্ষ পরাধীন, শক্তিহীন, সবই ঠিক, কিন্তু তাকেও এখন অন্য সকল দশ জনের সঙ্গে সমান তালে চল্‌তে হবে। আবার নিজেকে শক্তিমান্ ও স্বাধীন করতে হলেও দশজনের খবরাখবর রাখতে হবে, তাদের কলা-কৌশল সবই আয়ত্ত করতে হবে। এসব কারণে দেশ-বিদেশের বর্ত্তমান অবস্থার কথা জানা একান্ত আবশ্যক। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনীতির গতি কিরূপ, আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতিই বা কোন্ পথে চলেছে এসব বিষয় সাক্ষাৎ ভাবে জান্‌বার সুযোগ আমাদের নেই বল্‌লেই চলে। আমরা এখন যা' কিছু আয়ত্ত করতে পারি, বই পড়ে। এরূপ বইও বাংলায় খুব কমই আছে। আমি এ বইখানিতে এসব বিষয় আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি।

বইখানিতে যে-সব বিষয় আলোচনা করতে চেয়েছি সে-সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। জগতের বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে বল্‌তে হলে বইয়ের কলেবর অসম্ভব রকম বাড়াতে হয়। এজন্য আমি প্রধানতঃ সেই দেশগুলি সম্বন্ধেই আলোচনা করেছি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বর্ত্তমানে যাদের গুরুত্ব সকলের চেয়ে বেশী। তবে এর খানিকটা ব্যতিক্রমও যে না করা হয়েছে তা নয়। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটু বেশী করে বলেছি, আর এর সীমান্তবর্ত্তী দেশগুলি সম্বন্ধেও বিভিন্ন অধ্যায়ে কিছু কিছু তথ্য সন্নিবিষ্ট করেছি। প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা সকলের আগে প্রয়োজন। আজকের দিনে এ প্রয়োজনীয়তা বেশী করেই অনুভূত হচ্ছে। আফগানিস্তান,

ইরাণ, আরব, শ্যাম আমাদের অতি কাছে, অথচ এদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সামান্য। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এদের গুরুত্ব হয়ত তেমন নয়, কিন্তু আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, দেশ-রক্ষা প্রভৃতি নানা দিক থেকে এদের গুরুত্ব কম তো নয়ই, বরং বেশী। ব্রহ্মদেশ দু' বছর হ'ল ভারতবর্ষ থেকে আলাদা হয়ে গেছে। তথাপি ভৌগোলিক ও আন্তর্জাতিক কারণে এদেশটি বরাবর ভারতবর্ষেরই অঙ্গ হয়ে থাকবে। ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে আলাদা করে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি নি।

আর একটি কথাও এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক। আমি উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে এ বই লিখতে চেষ্টা করেছি। একেবারে শিশুদের জন্য এ বই নয়। এ বইয়ে এমন সব জিনিষও দিয়েছি যা থেকে সাধারণ পাঠকও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জান্‌তে পারবেন। রাজনীতির আলোচনা প্রত্যেক দেশেই শিক্ষার একটি অপরিহার্য্য বিষয়। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে যাতে কিশোর-কিশোরীরা এ বিষয়ের আলোচনায় আকৃষ্ট হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখেই বইখানি লিখেছি।

আমি বহু প্রামাণিক বই থেকে তথ্য নিয়েছি। যে-সব বন্ধু আমাকে পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়ে এবং প্রুফ দেখে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ বইয়ের ছবিগুলি 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকা থেকে নেওয়া। এজন্য এদের কর্ত্তৃপক্ষ আমার কৃতজ্ঞতাভাজন। প্রবাসী প্রেস ছবিগুলি ছাপতে সাহায্য করেও আমাকে বিশেষ উপকৃত করেছেন।

কলিকাতা
১লা বৈশাখ, ১৩৪৬ সাল

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

সূচীপত্র

আজকের দিনে বিজ্ঞানবলে জগতের বিভিন্ন দেশের ভিতর একটা বিশেষ যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। চীন, জাপান, ইটালী, জার্ম্মানী, চিলি, পেরু একেবারে যেন আমাদের ঘরের দুয়ারে। লণ্ডন হতে টোকিও বা মেলবোর্ণ—এই আট-দশ হাজার মাইল পথ আজ তিন দিনে যাওয়া যায়, একথা কয়েক বছর আগেও কি কেউ কল্পনা করতে পেরেছে? আবার, বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে কতকগুলি দেশ খুবই প্রবল হয়ে উঠেছে, আর প্রত্যহ একে অন্যের ঘাড় মট্‌কাবার চেষ্টা করছে। তাই দেশ-বিদেশের খবরাখবর রাখা এখন মানুষের পক্ষে একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু সবার আগে জানতে হবে নিজেদের কথা বিশেষ ক'রে।

আমাদের দেশ—এই ভারতবর্ষের মানচিত্র তোমরা সবাই দেখেছ। এর প্রায় তিন দিকে সমুদ্র—মাইল হিসাবে ধরতে

গেলে অনুমান সাত হাজার মাইল ব্যাপী এই সমুদ্র-তীর। সমগ্র উত্তর দিক জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের রাজা হিমালয়। পশ্চিম দিকের খানিকটা, ইরাণ ও আফগানিস্তান ও পূবদিকের খানিকটা, চীন ও শ্যাম একে বাইরের জগৎ থেকে আলাদা করে রেখেছে। এখানকার আবহাওয়া, গাছপালা, জীবজন্তু, নর-নারী, ধর্ম্ম-ভাষা এতই বিচিত্র যে, অনেকে একে একটা মহাদেশ বলে উল্লেখ করেন। বিস্তীর্ণ প্রান্তর, সু-উচ্চ পর্ব্বত, ঘন জঙ্গল, বাংলার মত নদ-নদী বিধৌত শস্য-শ্যামল দেশ আর রাজপুতানার মত নদীবিহীন বিস্তৃত মরুপ্রান্তর সবই এখানে রয়েছে। এজন্য আমাদের দেশকে একটি মহাদেশ বললে অগৌরবের কিছুই হয় না। কিন্তু স্বার্থপর লোকেরা আমাদের ভিতর ভেদবুদ্ধি বাড়াবার জন্য অন্য অর্থে এ কথাটি প্রয়োগ করেছে। ভারতবাসী এক জাতি, এক মন, এক প্রাণ হয়ে স্বদেশের উন্নতির জন্য যাতে চেষ্টা না করে এদের সেই উদ্দেশ্য। আজ কিন্তু এদের ফাঁকি সকলে ধরতে পেরেছে।

এত বৈচিত্র্যের মধ্যেও আমাদের মধ্যে কিন্তু একটি চিরন্তন ঐক্য বিদ্যমান। যুগে যুগে দেশের উপর দিয়ে কত ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে, তথাপি এই ঐক্যবোধ কেউ নষ্ট করতে পারে নি। বিজ্ঞান এই ঐক্যবুদ্ধি আরও বাড়িয়েই দিয়েছে।

তোমরা ভারতবর্ষের ইতিহাস এখনও পড়ছ। এ ইতিহাসকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে—হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ, মুসলমান যুগ,

ইংরেজ যুগ। একে ঢেলে সাজবার প্রস্তাব চলছে। আজ ইংরেজী উনিশ শ পঁয়তাল্লিশ সাল। এখন আমরা কোথায় এসে পৌঁছেছি? এর নির্দ্দেশ ইতিহাসের কাছে জিজ্ঞাসা কর—সে বল্‌তে পারবে। জাতির জীবনের পূর্ব্বাপর যোগসূত্র এতেই তোমরা পাবে। আজকের কথা কিন্তু তোমাদের বিশদভাবে জান্‌তে হবে, কেননা ভবিষ্যৎ তো তোমরাই গড়বে।

'স্বরাজ' কথাটির ভিতর দিয়ে ভারতবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বপ্রথম মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। বিগত ১৯০৬ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে সভাপতির মঞ্চ হতে দাদাভাই নৌরজী এই কথাটি উচ্চারণ করেন। তখন বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের মরশুম।

গত চল্লিশ বছরের ভিতর জগতের নানারূপ পরিবর্ত্তন ঘটেছে। ভারতবর্ষও ঠায় বসে নেই,—নানা আন্দোলন আলোড়নের বন্ধুর পথে চল্‌তে চল্‌তে বর্ত্তমান অবস্থায় এসে সে দাঁড়িয়েছে। স্বদেশী আন্দোলন, 'হোমরুল' আন্দোলন, বিশ্বব্যাপী মহাসমর, অসহযোগ আন্দোলন, সত্যাগ্রহ আন্দোলন, দ্বিতীয় মহাসমর ভারতবর্ষের মুক্তি-সাধনার এক একটি ধাপ। স্বদেশী আন্দোলন বাঙালীর প্রাণে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগায়। প্রথম মহাসমরের সময় আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উইলসন বলেছিলেন, যুদ্ধ শেষে পরাধীন জাতিগুলিকে স্বাধীনতা দান করা হবে। ইংরেজও তখন এ কথায় সায় দেয়। ভারতবাসী

তখন এই কথাতেই অনুপ্রাণিত হয়ে অজস্র ধন-জন দিয়ে তাদের সাহায্য করে। যুদ্ধের পর তাকে খানিকটা স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হ'ল বটে, কিন্তু এতে তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'ল না মোটেই।

এই সময়ে গুজরাট কাথিয়াবাড় নিবাসী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তন করেন। মহাত্মা গান্ধী ব'লে জগৎশুদ্ধ লোকে আজ তাঁকে চেনে। এ আন্দোলনের জের বহু বছর চলে। কিন্তু ইংরেজ তাতে কর্ণপাত করছে না দেখে ১৯৩০ সালে গান্ধীজী আবার স্বরাজ আন্দোলন সুরু করলেন। এ আন্দোলনের নাম দেওয়া হ'ল—আইন-অমান্য বা সত্যাগ্রহ আন্দোলন। লবণ আইন ভঙ্গ করেই হ'ল এ আন্দোলনের সূত্রপাত। পূর্ব্ব বারের অসহযোগ আন্দোলনের চেয়ে এবারকার আন্দোলন বহুব্যাপক ও বহুদূরপ্রসারী হ'ল—লক্ষাধিক লোক কারাবরণ করলে। বছর খানেকের ভিতরই আন্দোলন খুব তীব্র হয়ে উঠে। এই সব দেখে তৎকালীন বড়লাট লর্ড আরুইন (বর্ত্তমানে লর্ড হ্যালিফাক্স) মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। এ চুক্তির নাম হ'ল 'গান্ধী-আরুইন প্যাক্ট'। এর পর গান্ধীজী লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিলেন। ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থা কিরূপ হবে তা ঠিক করার জন্যই এ বৈঠক আহ্বান করা হয়। কংগ্রেসের মুখপাত্র রূপে মহাত্মা গান্ধী বৈঠকে জাতির মনোগত অভিলাষ সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করলেন। ইংরেজ সরকার তাঁর

কথায় কর্ণপাত করলেন না। তিনি স্বদেশে ফিরে এসে আবার জেলে গেলেন। এবারকার আন্দোলন তেমনভাবে সুরু না হতেই সরকার কঠোর হস্তে একে দমন করতে চেষ্টা করলেন।

গোলটেবিল বৈঠক পর পর তিন বার আহ্বান করা হয়। মহাত্মা গান্ধী দ্বিতীয় বারের বৈঠকে যোগ দেন। তৃতীয় বারে যখন বৈঠক বসে তখন তিনি জেলে। তিন বারে গোলটেবিল বৈঠকে যে-সব আলোচনা হয়েছিল তাকে নির্দ্দিষ্ট রূপ দেবার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট দ্বারা জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয়। ভারতের নির্ব্বাচকমণ্ডলী কিরূপ হবে তা নির্ণয়ের জন্যও এ সময়ে ভারতবর্ষে এক কমিশন প্রেরণ করা হয়েছিল।

এবারে ভোটদাতার সংখ্যা খুবই বেড়ে গেল। এক শ' জনের ভিতর চৌদ্দ জনের ভোট দেবার অধিকার জন্মে। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা উত্তীর্ণ যে-কেউ, অবশ্য সাবালক হলে, ভোট দানের অধিকারী। ভারতবর্ষে এখন তিন কোটি নরনারী ভোট দিতে পারে। এর আগে ডায়ার্কির আমলে ভোটদাতার সংখ্যা ছিল মাত্র পঁচাত্তর লক্ষ!

ভারতবর্ষে নূতন শাসনতন্ত্র খানিকটা চালু হয়েছে। এ সময় আগেকার কথাও তোমরা কিছু জেনে রাখো। বিংশ শতাব্দীর আরম্ভে এশিয়াবাসীদের মনে একটি বিশেষ কারণে নূতন আশার সঞ্চার হয়। তখন ক্ষুদ্র জাপান বিশাল রুশিয়াকে যুদ্ধে হারিয়ে দেয়। প্রাচ্যের অন্য দেশগুলিও ভাবতে শেখে,

তারা ক্ষুদ্র বা দুর্ব্বল হলেও ক্রমে শক্তি অর্জ্জন করে শক্তিমানকে তাড়িয়ে দিয়ে স্বাধীনতা লাভে সক্ষম হতে পারে। বঙ্গের স্বদেশী আন্দোলনের মূলে এই মনোভাব অনেকখানি কাজ করেছিল সাধারণের এরূপ বিশ্বাস। স্বদেশী আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল মর্লে-মিণ্টো রিফর্ম বা শাসন-সংস্কার। ১৯১০ সালে ভারতবর্ষে এই শাসন-তন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়।

তোমরা ইতিহাস ভূগোলে পড়েছ, ভারতবর্ষ দুই ভাগে বিভক্ত। এক অংশ খাস ইংরেজের অধীন, অন্য অংশ দেশীয় রাজন্যদের অধিকারে। এ পর্য্যন্ত এদেশে যে-যে শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়েছে সবই ঐ প্রথম অংশের মধ্যে। কিছু দিন 'ফেডারেশন' কথাটি খুবই শুনা গিয়েছিল। এ কথাটির অর্থ সম্মিলিত-রাষ্ট্র। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কথা তোমরা শুনে থাকবে। সে দেশটিও একটি 'ফেডারেশন' বা সম্মিলিত-রাষ্ট্র। ভারতবর্ষে যদি কোন দিন সত্যিকার ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয় তো এর আদর্শেই হবে। খাস ব্রিটিশ ভারত ও রাজন্যদের অধিকারভুক্ত ভারত দুই-ই এতে সন্নিবেশিত হবে। মর্লে-মিণ্টো রিফর্মে কিন্তু এর কল্পনাও হয়নি। তখন নির্ব্বাচন প্রথার সূত্রপাত হয়েছিল মাত্র।

দেশ-শাসন ব্যবস্থায় দেশীয় প্রতিনিধিদের সহযোগিতা অর্থে আমরা যা বুঝি এবারে কিন্তু তা একেবারেই দেওয়া হয় নি। প্রতিনিধিরা শাসন ও আর্থিক বিলি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে

আলোচনার ও মতামত প্রকাশের অধিকার পান মাত্র। প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদ ও নিখিল-ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ সর্ব্বত্রই একই ধারা অনুসৃত হ'ত। ব্যবস্থা-পরিষদে পৃথক পৃথক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন এই রিফর্মের আমলেই সুরু হয়। হিন্দু—হিন্দু প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করবে, মুসলমান—মুসলমান প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করবে ঠিক হয়। এ প্রথা জাতীয়তা-বোধ বৃদ্ধির পক্ষে কতখানি অন্তরায়, তোমরা ক্রমে তা বুঝতে পারবে। এবারে মিউনিসিপ্যালিটীগুলির এলাকাভুক্ত লোকেরাই বিশেষ করে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার পায়। পল্লীবাসীরা পেয়েছিল খুবই কম। কাজেই এ শাসন-সংস্কারকে 'শহুরে' শাসন-সংস্কারও বলা যেতে পারে।

এর পরে এল 'ডায়ার্কি'—মানে দ্বৈত-শাসন। শাসন-কার্য্য সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য গবর্ণমেণ্টের কতকগুলি বিভাগ আছে—যেমন, বিচার-বিভাগ, পুলিশ-বিভাগ, শাসন-বিভাগ, শিক্ষা-বিভাগ, কৃষি-বিভাগ, শিল্প-বিভাগ, আরও কত কি। প্রত্যেক বিভাগেরই একটি করে কর্ত্তা থাকেন, আবার সকলের উপরে থাকেন লাট সাহেবেরা। এবারকার এই ডায়ার্কির আমলে শাসন-কার্য্যকে দুই ভাগে ভাগ করা হ'ল। এক ভাগকে বলা হ'ল 'রিজার্ভড' বা 'সংরক্ষিত', এর অন্তর্গত বিভাগ গুলির কর্ত্তারা স্বয়ং রাজ-নিযুক্ত কর্ম্মচারী। এঁদের বিভাগীয় আয়-ব্যয় সকলই রাজ-ইচ্ছায় করা হ'ত, এর উপর ব্যবস্থা-পরি-

ষদের প্রতিনিধিদের কোন কথা খাটত না। তবে এ অংশের কর্ত্তাদের ভিতরও বাঙালী বা ভারতবাসী ছিলেন। দ্বিতীয় ভাগটিকে বলা হত 'ট্রান্স্ফারড' বা 'হস্তান্তরিত'। এই ভাগটির কর্ত্তারা নিযুক্ত হতেন ব্যবস্থা-পরিষদে নির্ব্বাচিত সদস্যদের ভিতর থেকে। এঁদের বেতন. বিভাগীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রভৃতির জন্য জবাবদিহি করতে হ'ত ঐ ব্যবস্থা-পরিষদের নিকটে। এঁদের নাম দেওয়া হ'ল 'মিনিষ্টার' বা মন্ত্রী। ভারতবর্ষে প্রতিনিধিমূলক শাসনের আংশিক সূত্রপাত হয় এ সময় থেকে। কারণ ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যদের অধিকাংশের ভোটের উপর নির্ভর করত এসব মন্ত্রীর অস্তিত্ব ও কার্য্যাকার্য্যের বিচার।

প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদগুলির সম্বন্ধেই এই ব্যবস্থা হ'ল। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের ক্ষমতা কিন্তু আগেকার মতই প্রায় রইল। সেনা-বিভাগ, বৈদেশিক-বিভাগ প্রভৃতি কতকগুলি বিভাগে সদস্যদের মতামত মোটেই গ্রাহ্য হ'ল না। অন্য কোন কোন বিষয়ের উপর তাঁদের ভোট দেবার অধিকার রইল। কিন্তু দেখা গেছে—কোন কোন প্রস্তাব ভোটে অগ্রাহ্য হলেও বড়লাট বিশেষ ক্ষমতা বলে তা বাহাল করে নিয়েছেন। ডায়ার্কির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, এবার শহর ছেড়ে 'সংস্কার' পল্লীতে প্রবেশ করলে। এবারকার ভোটদাতারা প্রধানতঃ শহরের মধ্যেই আবদ্ধ না থেকে পল্লীর জনসাধারণের ভিতরও ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। মর্লে-মিণ্টো রিফর্মে যে পৃথক্ নির্ব্বাচন প্রথা

অনুসৃত হয়েছিল এবারে তা শুধু বাহালই রইল না, ভোটদাতার সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দূর দূরান্তরের নিভৃত পল্লীতে পর্য্যন্ত এ প্রথা ছড়িয়ে পড়ল। ফলে হিন্দু-মুসলমানে ভেদ-বুদ্ধি বেড়েই চল্‌ল।

ভারতে 'ডায়ার্কি' বা দ্বৈত-শাসন প্রবর্ত্তিত হয় ১৯২১ সালে। এর দীর্ঘ ষোল বছর পরে বর্ত্তমান ব্যবস্থা অংশতঃ প্রবর্ত্তিত হয়েছে। অংশতঃ বলছি এইজন্য যে, নিখিল-ভারতীয় শাসন ব্যাপারে এখনও আগেকার ধারাই বাহাল আছে। স্বদেশী যুগের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে এল মর্লে-মিণ্টো রিফর্ম, আর মহাযুদ্ধের সময়ে পরাধীন ভারতবাসীর অন্তরে যে মুক্তি-বাসনা জেগে উঠল তা আংশিক চরিতার্থ করবার জন্য এল ডায়ার্কি। কিন্তু এতে দেশবাসী মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারে নি। এর প্রবর্ত্তনের প্রাক্কালে জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড,তুর্কির খিলাফৎ ধ্বংস ইত্যাদি দিকে দিকে ভারতবাসীর অসহায়তার কথাই জানিয়ে দিলে। নবাগত ডায়ার্কি সম্বন্ধে লোকের মনে ঘোর সন্দেহের সৃষ্টি হ'ল। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন একে 'অভিনন্দিত' করে,—আর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ্য আন্দোলন এর অসারতা প্রতিপাদন করে। কয়েক বছর ধরে দেশব্যাপী যে বিরাট্ মুক্তি আন্দোলন চলেছিল তার ফলে প্রথমে সাইমন কমিশন ভারতবর্ষে প্রেরিত হয়, পরে বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকও আহূত হয়। গোলটেবিল

বৈঠকের পরে লণ্ডনে বসে একটি পার্লামেণ্টারী কমিটী বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থার খসড়া তৈরি করেন। এই খসড়া আইনে পরিণত হয়ে '১৯৩৫ সালের ভারতীয় আইন' নামে পরিচিত হয়।

এই আইনকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে—একটি প্রাদেশিক, অন্যটি নিখিল-ভারতীয়। প্রাদেশিক অংশ গত ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রবর্ত্তিত হয়। নূতন আইনে এগারটি প্রদেশে স্বায়ত্ত-শাসন চালু হবার কথা,—হয়েছেও তাই। কুর্গ, দিল্লী, বেলুচিস্তান প্রভৃতি কয়েকটি ছোট ছোট প্রদেশে এ ব্যবস্থা বলবৎ হয় নি। ডায়ার্কির সঙ্গে এ আইনের ঢের তফাৎ। এখন সরকারী কোন বিভাগই 'সংরক্ষিত' বা লাট সাহেবের খাস অধীন নয়। সবগুলিই মন্ত্রীদের হাতে এসেছে। আগেকার আমলে সরকার-মনোনীত কতকগুলি সদস্য ব্যবস্থা-পরিষদে থাক্তেন, তাঁরা প্রায়ই সরকার পক্ষে ভোট দিতেন। এখন এ ব্যবস্থা প্রায় তুলে দেওয়া হয়েছে। যে-সব প্রদেশে দুটি ব্যবস্থা-পরিষদ আছে সেখানে উচ্চতর পরিষদে মাত্র কয়েকজন করে মনোনীত হচ্ছেন এখনও। এ ছাড়া, প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদগুলি এখন গণ-প্রতিনিধি দ্বারাই গঠিত বলা চলে। এ গণ-প্রতিনিধিদের ভিতর যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ তা থেকে এবারে মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হবার ব্যবস্থা হয়।

জাগ্রত ভারত

আগে তোমরা জেনেছ, মর্লে-মিণ্টো আমল থেকে ভারতবর্ষে পৃথক্ নির্ব্বাচন প্রথা চলে আস্‌ছে। এবারে এতে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হ'ল। যে-সব প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যায় অধিক সে-সব স্থানে স্বভাবতঃই ব্যবস্থা-পরিষদে তাদের প্রাধান্য হয়। মুসলমান-আধিক্য প্রদেশগুলির ব্যবস্থা-পরিষদেও মুসলমান-দেরই প্রাধান্য ঘটে ঐ একই নিয়মে। এতে জাতীয়তার ভিত্তিতে দল গঠন করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। জাতির স্বার্থের চেয়ে সম্প্রদায়ের স্বার্থই বেশী করে দেখবার চেষ্টা হয়। কেউ নিজ সম্প্রাদায়ের মঙ্গলকর কাজ করলে তাতে অন্য কারুর আপত্তি থাকে না। কিন্তু সম্প্রদায়গত স্বার্থ যখন জাতিগত বা সর্ব্বজনীন স্বার্থকে ছাপিয়ে ওঠে তখনই তা, কি সম্প্রদায়—কি জাতি, সকলের পক্ষেই অকল্যাণকর হয়ে পড়ে। কয়েকটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান এই সব ভেদ-নীতি দ্বারা চালিত হয়ে কার্য্য করছে, আর ভেদ-নীতির উদ্যোক্তারা আজ অন্তরালে থেকে মুচ্‌কি হাসি হাস্‌ছেন। এ সমূহ বিপদে কংগ্রেস কি নীতি অনুসরণ করেছে তা তোমাদের জানা দরকার।

ভারত-শাসন আইনের প্রাদেশিক অংশ যা ১৯৩৭ সালে প্রবর্ত্তিত হয় তাতে দোষ ত্রুটি বহু আছে। তাই নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হলেও কংগ্রেস প্রথমে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চায় নি। কংগ্রেস এগারটির মধ্যে ছয়টি প্রদেশের

ব্যবস্থা-পরিষদেই সংখ্যাধিক্য লাভ করে। সরকারের সঙ্গে কিছুকাল বাদানুবাদ চালাবার পর কংগ্রেস তরফে এসব স্থানে মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হয়। অন্য দুটি প্রদেশেও পরে কংগ্রেসেরই সংখ্যাধিক্য ঘটে। জাতি ধর্ম্ম বর্ণের বিশেষ বিশেষ দাবির কথা কাণে না তুলে সকল মানুষেরই সেবা করা কংগ্রেসের লক্ষ্য। আর দীন দরিদ্রের সেবায় তৎপর হওয়াই এর প্রধান কাজ। কংগ্রেসেরই চেষ্টায় ও উদ্যোগে কৃষক ও জনমজুরদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন প্রদেশে আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। এতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলেই সমানভাবে উপকৃত। এসময়, কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ কর্ত্তৃত্ব যদিও আটটি প্রদেশে স্থাপিত হয়, তথাপি সিন্ধু সমেত নয়টি প্রদেশই তার কার্য্যক্রম মেনে চলে। তখন বাংলা এ পঞ্জাবে কংগ্রেস কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। পৃথক্ নির্ব্বাচন প্রথাই এজন্য সর্ব্বপ্রকারে দায়ী। ভারত-শাসন আইনে হিন্দুদের স-বর্ণ ও অ-বর্ণ (হরিজন) এই দুই ভাগে ভাগ করে তাদের ভিতরও পৃথক্ নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তন করবার চেষ্টা হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী যথাসময়ে মরণ পণ করে এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন ব'লে এ প্রথার অনেকটা পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে। এখন স-বর্ণ অ-বর্ণ সকল শ্রেণীর হিন্দুকেই সকলের জন্য ভোট দিতে হয়, যদিও অ-বর্ণদের জন্য প্রত্যেক প্রদেশেই কতকগুলি আসন সংরক্ষিত।

তোমাদের নিকট ফেডারেশনের উল্লেখ করেছি। বর্ত্তমান

ভারত-শাসন আইনের এক অংশে ফেডারেশন বা নিখিল-ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা আছে। এর কতকটা আভাষ আগে তোমরা পেয়েছ। ভারতবর্ষে ফেডারেশন বা নিখিল-ভারতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নিয়ে ক'বছর ধরে খুব বাদানুবাদ হয়েছিল।

সকলেরই ঐকান্তিক বাসনা—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মত ভারতবর্ষে একটা স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক। কংগ্রেস এই বাসনাকে সর্ব্বজনীন করে তুলেছেন। নরম গরম সকল দলই চান—ভারতবর্ষে যত শীঘ্র সম্ভব এইরূপ একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়। তাকে ফেডারেশন বল ক্ষতি নাই, যুক্তরাষ্ট্র বা সম্মিলিত-রাষ্ট্র, তাও বল্‌তে পার। ব্রিটিশ ভারত ও 'ভারতীয়' ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারী এই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাদের সুখ-দুঃখ উন্নতি-অবনতি এই রাষ্ট্রের কার্য্যকলাপের সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত থাক্‌বে। কিন্তু এ রাষ্ট্র হবে স্বাধীন, স্বয়ংপূর্ণ। ভারতে এভাবে এক মহাজাতি গড়ে উঠবে, দেশ-রক্ষায় বা বিদেশের সঙ্গে সম্বন্ধ নির্ণয়ে তার থাক্‌বে অবাধ অধিকার। এরূপ যুক্তরাষ্ট্র বা ফেডারেশনই আমরা চাই। কিন্তু ভারত-শাসন আইনে ফেডারেশন বা সম্মিলিত-রাষ্ট্রের নমুনা যা প্রকাশ পেয়েছে, তাতে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

প্রায় ষোল বছর যাবৎ যে ডায়ার্কি বা দ্বৈত-শাসনের অসারতা বার বার প্রতিপন্ন হয়েছিল তা-ই প্রবর্ত্তন করার চেষ্টা

চলে নিখিল-ভারতীয় শাসন ব্যাপারে। প্রস্তাবিত ফেডারেশনে অধিকাংশ প্রয়োজনীয় বিষয়ই থাক্‌বে সংরক্ষিত, সামান্য সামান্য কিছু ভারতীয় মন্ত্রীদের হাতে আস্‌বে। তোমাদের এই বললেই যথেষ্ট হবে যে, ভারত গবর্ণমেন্টের বার্ষিক যত টাকা আয় হয় (প্রায় দেড় শ' কোটি টাকা) তার শতকরা আশী টাকা ব্যয়িত হবে বড়লাটেরই ইচ্ছামত, বাকী কুড়ি টাকা ব্যয়ের ভার থাকবে ভারতীয়দের হাতে। নিখিল-ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের কোনরূপ মতামতই ঐ আশী টাকা সম্পর্কে গ্রাহ্য হবে না, তাঁরা মাত্র কুড়ি টাকার উপরই খবরদারি করতে পারবেন! তারপর নিখিল-ভারতীয় এই যুক্তরাষ্ট্র-পরিষদ কিভাবে গঠিত হবার কথা হয় তা একবার দেখ। এই পরিষদের সদস্য সংখ্যা মোট তিন শ' পঁচাত্তর। এর এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ এক শ' পঁচিশজন সদস্য ভারতের রাজন্যবর্গের ভিতর থেকে নির্ব্বাচিত হবে। বাকী যা থাকবে তার এক তৃতীয়াংশ পাবে মুসলমানেরা। শিখ, খ্রীষ্টান, ফিরিঙ্গী, ইউরোপীয় প্রভৃতিদের দিয়ে অবশিষ্টাংশ পাবে হিন্দুরা। এতেও কংগ্রেসের আপত্তি ছিল না—যদি জাতীয়তার ভিত্তিতে পরিষদ গঠিত হ'ত। কিন্তু তা হয় নি। যে ভেদ-বুদ্ধি এতকাল তৃতীয় পক্ষের উস্কানিতে ভারতময় ছড়িয়ে পড়েছে, নিখিল-ভারতীয় ব্যাপারে তাকে পাকা মসনদে প্রতিষ্ঠিত করতে দেওয়া জাতির পক্ষে আত্মহত্যারই সামিল। তারপর দেশীয় রাজ্যগুলির অধিকাংশেই এখনও

স্বৈর-শাসন প্রচলিত। এখানকার অধিবাসীদের ধন-প্রাণ, মান-মর্য্যাদা এখনও অনেকটা স্বৈরাচারী রাজার খেয়াল-খুশীর উপর নির্ভর করে। এদের আভ্যন্তরিক শাসনে সংস্কার সাধিত না হলে অর্থাৎ সেখানকার জনগণের হস্তে শাসনভার অর্পণের সুবিধা করে না দিলে, প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে স্বৈরাচারী রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিই যুক্তরাষ্ট্র-পরিষদকে ভারাক্রান্ত করবে, জন-প্রতিনিধিদের তাতে স্থান হবে না। কাজেই স্বাধীনতার পথে তাঁদের বিঘ্ন ঘটাবার খুবই সম্ভাবনা।

ইতিমধ্যে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে ভীষণ সঙ্কট উপস্থিত হয়। জার্ম্মানী পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করায় ব্রিটেন ও ফ্রান্স তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে। ভারতবর্ষে ফেডারেশন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখা হ'ল।

ওদিকে কংগ্রেসও বসে নেই। কংগ্রেসের লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা। কংগ্রেস তরফে যে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা হয়েছিল তা ঐ উদ্দেশ্যের দিকে নিজেদের দ্রুত এগিয়ে দেবার জন্যই। কিন্তু ইউরোপীয় যুদ্ধে ব্রিটেন লিপ্ত হয়ে পড়লে ভারতবর্ষকেও যে তাতে যোগ দিতে হবে। কংগ্রেস-নেতৃবর্গ বল্লেন, নাৎসীবাদ তথা হিটলারী শাসনের তাঁরা ঘোরতর বিরোধী, কিন্তু ব্রিটেনকে সুস্থ/ও স্বচ্ছন্দ চিত্তে সাহায্য করতে হলে তাঁদের পক্ষে অগ্রে আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভ করা অত্যাবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট পক্ষ থেকে এ সম্বন্ধে কোন আশ্বাস না পাওয়ায় যুদ্ধারম্ভের অল্পকাল পরেই

কংগ্রেসী-মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করলেন। দেশের নিয়মতন্ত্র গঠন করবার জন্য কনষ্টিটিউয়েণ্ট এসেম্ব্লী বা গণ-পরিষদ আহ্বান করতে হবে এ দাবিও কংগ্রেস নেতারা ঐ সময় ব্রিটেনকে জানিয়ে দিলেন।

বড়লাট এর কিছুকাল পরে বোম্বাইয়ে এক বক্তৃতায় ঘোষণা করলেন যে, ভারতবর্ষকে যুদ্ধান্তে 'ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্' বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া হবে। বড়লাট ও মহাত্মা গান্ধীর ভিতর আলাপ-আলোচনা স্বুরু হ'ল, কিন্তু কোন মীমাংসাই সম্ভবপর হ'ল না। তখন কংগ্রেস-সভাপতি মৌলানা আবুলকালাম আজাদ ঘোষণা করলেন যে, আশু কোনরূপ সন্তোষজনক মীমাংসা না হলে জাতি দৃঢ় চিত্তে নিজ নির্দ্দিষ্ট পথেই চল্তে থাক্বে।

কংগ্রেসের কথা তোমাদের অনেক কিছু বল্লাম। তোমরা বুঝতেই পারছ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রচেষ্টায় এর কৃতিত্ব কতখানি। কংগ্রেস ভারতবাসীকে নবজীবন দান করেছে। কংগ্রেসের মূলে কে ছিলেন জান? জাতি যখন স্বাধীন হবে, তখন তাঁর কথা লোকে সকলের আগে স্মরণ করবে। তিনি হলেন স্বুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তোমরা বড় হয়ে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশও জাতির প্রাণে একটা নূতন সাড়া এনে দিয়েছিলেন। তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে কংগ্রেসের কার্য্যে মনপ্রাণ সঁপে দেন।

কংগ্রেস অপোষ-মীমাংসার আশায় আর কত কাল বসে থাক্‌বে? মহাত্মা গান্ধী পুনরায় জাতির পক্ষে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করলেন। তিনি স্পষ্ট করে বললেন যে, নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে ইউরোপে যে সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে তাতে কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটাবার জন্য তিনি এ আন্দোলন সুরু করেন নি, ভারতীয় ব্যাপারে ভারতবাসীর আত্মকর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি এ আন্দোলন আরম্ভ করেছেন। তবে এবারকার সত্যাগ্রহ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক না করে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি ও দলের মধ্যেই একে সীমাবদ্ধ রাখা হ'ল! কংগ্রেসের সভাপতি সমেত ভারতের গণ্যমান্য নেতা প্রায় সবাই কারাবরণ করলেন। আগেকার কংগ্রেসী প্রধান মন্ত্রীরাও এ থেকে বাদ পড়েন নি।

মহাসমরও ইতিমধ্যে ইউরোপের সর্ব্বত্র অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সের পতন, ইংলণ্ডে ভীষণ বোমা-বর্ষণ, বল্কান অঞ্চলে হিটলারের দ্রুত অগ্রগতি ও গ্রীস-বিজয়, উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধ এবং রুশিয়া ও জার্ম্মানীর মধ্যে সংগ্রাম মহাসমরের মোড় ফিরিয়ে দিলে। ওদিকে ইটালী, জার্ম্মানী ও জাপান এই তিন বন্ধুতে বহুদিন যাবৎ খুবই মিতালী। ব্রিটেনের এই দুঃসময়ে তারা আবার নূতন করে সন্ধিবদ্ধ হ'ল। জাপান সুযোগ বুঝে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্রিটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধিকৃত পূর্ব্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল আক্রমণ করলে। এখন এশিয়া মহাদেশে এক দিকে ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র আর অপর দিকে

জাপান লড়ছে। যুদ্ধারম্ভের পর কয়েক মাসের মধ্যেই জাপান উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীকেই বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হটাতে সক্ষম হয়। সমগ্র ব্রহ্মদেশ কবলিত ক'রে জাপান আমাদের ঘরের দুয়ারে এসে হানা দেয়।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই সময় ব্রিটিশ নীতির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হয় বটে, কিন্তু তা দেশের স্বাধীনতা লাভের পক্ষে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয় নি। বড়লাটের শাসন-পরিষদে কয়েকজন ভারতবাসীকে স্থান দেওয়া হ'ল। জাপানের যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসী নেতাদের কারামুক্তিও ঘটে। জাপান যখন ব্রহ্ম অভিযানে ব্যস্ত, সেই সময় ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা অন্যতম মন্ত্রী সার্ ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্স্কে ভারতীয় শাসন সম্পর্কে একটি নূতন প্রস্তাব সহ এদেশে পাঠান। এর ফলও বিশেষ শুভ হয় নি। ভারতীয় নেতৃবর্গ চেয়েছিলেন সুষ্ঠুভাবে যুদ্ধ-পরিচালনার জন্য দেশ-শাসন ব্যাপারে সম্পূর্ণ আত্ম-কর্ত্তৃত্ব। কিন্তু ব্রিটেন তাতে রাজি না হওয়ায় সবই বানচাল হয়ে যায়। এর অব্যবহিত পরেই বড়লাটের শাসন-পরিষদ দ্বিতীয় বার প্রসারিত করা হয় এবং পনর জন সদস্যের মধ্যে এগার জনই হন ভারতবাসী। কিন্তু সর্ তেজ বাহাদুর সাপ্রুর মত ধীরপন্থী নেতা এ ব্যবস্থার সমালোচনা করে বলেন যে, এসব সত্ত্বেও ব্রিটেনেই ভারতবর্ষ শাসনের চাবিকাঠি রয়ে গেছে; শাসনপরিষদে ভারতবাসীদের সংখ্যাধিক্য ঘট্‌লেও কর্ত্তৃত্ব করবেন বিলাতের প্রভুরা!

একটু আগেই ব্রহ্মদেশের কথা বল্‌লাম। ব্রহ্মদেশ ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকারে আসে গত শতাব্দীর শেষভাগে। সেই থেকে ভারতবর্ষের অঙ্গ হিসাবে সে-দিন পর্য্যন্তও গণ্য হতে থাকে। মাত্র গত ১৯৩৫ সাল হতে একে ভারতবর্ষ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করা হয়েছে। ভারতবর্ষের মত ব্রহ্মদেশেও নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। গত ১৯৪২ সালে ইংরেজ সেখান থেকে চলে আস্‌তে বাধ্য হয় বটে, কিন্তু তখন থেকেই তারা একে পুনরুদ্ধার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়।

জাপান ব্রহ্মদেশ অধিকার করেই ক্ষান্ত ছিল না, তার লোলুপ দৃষ্টি ভারতবর্ষের উপরও নিবদ্ধ ছিল। কলিকাতায়, সিংহলে, মাদ্রাজে, আসামে, চট্টগ্রামে বিমান হতে বোমা-বর্ষণ এবং স্থলপথে মণিপুর আর জলপথে বঙ্গোপসাগরে ব্রিটিশ জাহাজ আক্রমণে তার কতকটা প্রমাণও পাওয়া গেল। এদিকে ব্রিটেন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এক যোগে ভারতরক্ষার ব্যবস্থা করলে। নূতন নূতন সৈন্য, বিমানপোত, রসদপত্র ভারতবর্ষে আমদানী করা হ'ল বিস্তর। কলিকাতা, মাদ্রাজ, চট্টগ্রাম এবং আসামের বিভিন্ন অঞ্চল সুরক্ষিত করারও চেষ্টা হয়। বিমান-আক্রমণ থেকে ঘরবাড়ী ধনজন কিরূপে রক্ষা পাবে তাই হ'ল প্রধান সমস্যা।

এ সময়ে কংগ্রেসের কার্য্যকলাপও আমাদের কতকটা জেনে রাখা দরকার। ক্রিপ্‌স সাহেবের প্রস্তাবে কেউই সন্তুষ্ট না হওয়ায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তা প্রত্যাখ্যান করে নিলেন এবং

বড়লাটের শাসন-পরিষদে ভারতীয় সদস্য-সংখ্যা বাড়িয়ে এই ভাবই প্রকাশ করতে লাগ্‌লেন যে, তাঁদের যেন আর কিছুই করণীয় নেই। তাই কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে পুনরায় সত্যাগ্রহ আরম্ভের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। কিন্তু সরকার এবার আর নেতৃবর্গকে অবসর দিলেন না। প্রস্তাব গৃহীত হবার পরদিনই তাঁরা প্রধান প্রধান কংগ্রেস নেতাকে আবার কারারুদ্ধ করলেন। এর ফলে ভারতবর্ষে স্থানে স্থানে দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়। বহু কংগ্রেসসেবীকে পুনরায় কারারুদ্ধ করা হ'ল।

ভারতবর্ষে ও বিলাতে সরকার-পক্ষ প্রচার করেন যে, কংগ্রেসীরা মুখে অহিংসার কথা বল্‌লেও তাঁদের কার্য্যের ফলেই এই সব দাঙ্গাহাঙ্গামা সংঘটিত হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কারাগারে আবদ্ধ। তাঁদের পক্ষে এর প্রতিবাদ করা অসম্ভব। গান্ধীজী নিজের ও তাঁদের তরফে উক্ত সরকারী উক্তির প্রতিবাদ ক'রে ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড লিনলিথ্‌গোকে এবং ভারত-সচিব লিওপোল্ড আমেরীকে পত্র লেখেন। কিন্তু এতে সরকারের মতের কোনও পরিবর্ত্তন হয় নি। তিনি অগত্যা কারাগারে থেকেই একুশ দিন অনাহারের সঙ্কল্প করেন। কারা-প্রাচীরের মধ্যে বসে দুর্ব্বল শরীরে অত দিনের উপবাস সহ্য হবে না ব'লে অনেকে আশঙ্কা করেছিলেন। ভারতবর্ষে ও বিদেশে এ নিয়ে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়। কিন্তু শেষ

পর্য্যন্ত গান্ধীজী অনশন-ব্রত উদ্‌যাপন করতে সক্ষম হলেন। মধ্যে মধ্যে কোন কোন কংগ্রেসকর্ম্মী কারামুক্ত হলেন বটে, কিন্তু তখনও নেতৃবৃন্দ সমেত সমগ্র ভারতে অন্যূন চল্লিশ সহস্র কংগ্রেসসেবী কারারুদ্ধ ছিলেন।

সরকার এর পরে স্বেচ্ছামত কার্য্য করে চলেন। চীন ও রুশিয়ার শত্রুদের ঘায়েল করার জন্য একরকম 'পোড়া-নীতি' অনুসৃত হয়। এর মানে স্বদেশবাসীরা শত্রুর আক্রমণে যতই পিছু হট্‌তে থাকবে ততই সে-সব স্থানের খাদ্যদ্রব্য, আবাসস্থল প্রভৃতি অগ্নি সংযোগে পুড়িয়ে দিতে থাক্‌বে। ভারতবর্ষে এ নীতির কথা উত্থাপনেই সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ থেকে ভীষণ আপত্তি হয়। তাদের তুষ্টিসাধনের জন্য এ নীতি পরিত্যক্ত হ'ল বটে, কিন্তু ক্রিপ্‌স সাহেব ভারত পরিত্যাগের পূর্ব্বে এমন একটি ব্যবস্থা বাংলে দিয়ে গেলেন যা প্রায় ঐ পোড়া-নীতিরই সামিল। ভারতবর্ষের আক্রান্ত ও আক্রমণের আশঙ্কাযুক্ত স্থানসমূহ থেকে সরকার নৌকাদি স্থানীয় যানবাহন ও চাল প্রভৃতি খাদ্য-শস্য কিনে নিতে আরম্ভ করলেন, কোন কোন অঞ্চল থেকে কিঞ্চিৎ অর্থের বিনিময়ে লোকজনকে নিজ নিজ ঘরবাড়ী ছেড়ে সরে যেতে বাধ্য করালেন। বাংলাদেশই জাপানীদের প্রধান লক্ষ্য ব'লে সরকার মনে করলেন। এ কারণ এ প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেই ঐ নীতি সবচেয়ে বেশী অনুসৃত হ'ল। ফলে জনসাধারণের স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্য, গতিবিধি ও কৃষিকার্য্যে

বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। অত্যাবশ্যক খাদ্যদ্রব্য ও নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিষপত্র অগ্নিমূল্য হয়ে উঠে।

এখানে আর একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার। যে বাংলা ভারতের শস্যাগার বলে একদিন সর্ব্বত্র বিদিত ছিল, সেখানে গত ত্রিশ-চল্লিশ বছরের মধ্যে পাট-চাষের প্রসারলাভ হেতু প্রয়োজনানুরূপ খাদ্যদ্রব্য আর উৎপন্ন হয় না। আমরা চালের জন্য পরমুখাপেক্ষী, ব্রহ্মদেশ হতে প্রচুর চাল এখানে আমদানী ক'রে তবে আমাদের অভাব পূরণ করা হ'ত। বিভিন্ন প্রদেশ হতেও চাল ডাল আটা প্রচুর আস্‌ত। ব্রহ্মদেশ এখন পরহস্তগত। যুদ্ধের গতিকে রেলগাড়ীর অভাব হওয়ায় অন্যান্য প্রদেশ হতে বঙ্গে ঐ সব দ্রব্য আমদানীও প্রায় অসম্ভব হ'ল। এ কারণ বঙ্গে বাঙালীর প্রধান খাদ্য চালের দর কয়েক মাস যাবৎ মণ করা চল্লিশ টাকা হতে একশ' টাকা পর্য্যন্ত হয়েছিল! এর ফল কি ভয়াবহ হয়েছিল তা কল্পনা করতেও গা' শিউরে উঠে। আমরা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা শুনেছি। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এতদিন ছিল ইতিহাসের বস্তু, কিন্তু কল্পনারও অতীত। এই সময় এই কল্পনাতীত ঘটনা বাস্তব হয়ে আমাদের মধ্যে দেখা দেয়। বঙ্গের রাজধানী কলিকাতায় ও দূর দূর অঞ্চলেও লক্ষ লক্ষ নর-নারী-শিশু ১৯৪৩ সালের আগষ্ট মাস হতে নবেম্বর মাসের মধ্যে অনশনে কঙ্কালসার ও রোগক্লিষ্ট হয়ে দেহত্যাগ

করে। এবারকার বাস্তব ছিয়াত্তরের মন্বন্তর তথা অনশনে মৃত্যুর দৃশ্য ভারতবাসী কখনও ভুলতে পারবে না।

তবে এই সারা বাংলাব্যাপী মন্বন্তরের মধ্যেও একমাত্র আশার কথা এই যে, এ সময়ে বাংলার বাহিরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ, নগর ও জনপদ হতে অনশনক্লিষ্ট বাঙালীর মুখে দুমুঠো অন্ন দেবার জন্য বিশেষরূপে আয়োজন করা হয়। ভারতবাসী যে একজাতি একপ্রাণ, স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিরুদ্ধ পক্ষীয়দের বিপরীত প্রচার সত্ত্বেও বারে বারে দুঃখ-দৈন্য মন্বন্তরের মধ্যেই তা প্রমাণিত হয়ে থাকে। এখানে আর একটি কথাও বিশেষভাবে স্মরণীয়। ভূতপূর্ব্ব প্রধান সেনাধ্যক্ষ লর্ড ওয়াভেল নূতন বড়লাট রূপে ভারতবর্ষে পদার্পণ ক'রে কলিকাতায় আসেন ও অনশনক্লিষ্ট নর-নারীর দুঃখ-দৈন্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। ভারত-সরকার পরে যে নিরন্ন দেশবাসীর অন্ন যোগাবার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন, লর্ড ওয়াভেলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এর জন্য হয়ত অনেকখানি দায়ী।

বিদেশ থেকেও নিরন্ন ভারতবাসীর সাহায্য দানের কিঞ্চিৎ ব্যবস্থা হয়। মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রে নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তা বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীমতী পার্ল বাক সাহায্য-দান ব্যবস্থায় বিশেষ উদ্যোগী হন। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাহায্য আসে আয়র্লণ্ড হতে। গত শতাব্দীতে আয়র্লণ্ডের ভাগ্য প্রায় আমাদের মতই দুঃখ-দৈন্যে পূর্ণ ছিল। সেখানেও মধ্যে মধ্যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হ'ত

ও বহু লোক অনশনে মারা যেত। সহৃদয় ভারতবাসী তখন বহুবার তাদের সাহায্য করতে অগ্রসর হয়। ভারতবর্ষের এই দুঃখের দিনে রাষ্ট্রপতি ডি ভ্যালেরার নেতৃত্বে সরকার পক্ষ ও বিরোধী দল সকলে মিলে এর সাহায্যকল্পে এক লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ বর্ত্তমান বিনিময় হারে প্রায় তের লক্ষ টাকা দান ক'রে সহৃদয়তারই পরিচয় দিয়েছেন।

ভারতবর্ষের অভাব অনটন লেগেই আছে। তবে এর মধ্যে আশার কথা এই যে, ইউরোপের বর্ত্তমান মারাত্মক যুদ্ধ শেষ হয়েছে। জার্ম্মাণী মিত্রশক্তি, বিশেষতঃ সোভিয়েট রুশিয়া কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত, পরাজিত, হিটলার মৃত। ইটালীর অবস্থাও তদ্রূপ। মুসোলিনীকে তাঁর দেশবাসীরা নিহত করেছে। পূর্ব্বদিকে জাপানও ধীরে ধীরে হটে যাচ্ছে। ব্রহ্মদেশের বেশীর ভাগই ব্রিটিশরা পুনরধিকার করে নিয়েছে।

ইউরোপে মহাসমর কার্য্যতঃ শেষ হবার পূর্ব্ব থেকেই ভারতবর্ষ সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতির কিছু রদ-বদল হবার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল। বড়লাট লর্ড ওয়াভেল বর্ত্তমান ১৯৪৫ সালের প্রথম দিকে বিলাত যান ও সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেন। মহাত্মা গান্ধী বৎসরখানেক পূর্ব্বেই শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন মুক্তি পেয়েছিলেন, আরও কেউ কেউ মুক্তি পেয়েছেন, কিন্তু লর্ড ওয়াভেল জুন মাসের প্রথমে ভারতবর্ষে ফিরে এসেই কংগ্রেস

ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণকে মুক্তি দিলেন এবং একটি 'অস্থায়ী জাতীয় গবর্ণমেণ্ট' স্থাপনের উদ্দেশ্যে ২৫শে জুন তারিখে শিমলায় বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে এক বৈঠক আহ্বানের কথা বেতারে ঘোষণা করলেন। পনর জন সদস্য নিয়ে শাসন-পরিষদ গঠিত হবে, বড়লাট ও জঙ্গীলাট বাদে আর তের জনই হবেন ভারতীয়। ঐসঙ্গে এ কথাও বলা হয় যে, বর্ণহিন্দু ও মুসলমান পাঁচজন করে সমানসংখ্যক সদস্য থাক্‌বেন এই পরিষদে। মহাত্মা গান্ধী আহূত হলেও বৈঠকের প্রকাশ্য অধিবেশনে যোগ দেন নি, কংগ্রেসপক্ষে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি মৌলানা আবুলকালাম আজাদ আর লীগ পক্ষে ছিলেন মহম্মদ আলি জিন্না। বৈঠকে সকলেই জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনায় একমত হলেন বটে, কিন্তু মূল উদ্দেশ্যটি—অর্থাৎ সাময়িকভাবে কাজ চালাবার মত কেন্দ্রে একটি জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা—আর কার্য্যে পরিণত হ'ল না। কংগ্রেসকে একটি বর্ণহিন্দু প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন পক্ষের হয়ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কংগ্রেস একমাত্র নিখিল-ভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান, এ হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পার্শী, খ্রীষ্টান সকল সম্প্রদায়েরই সমান হিতকারী। সুতরাং কংগ্রেস সকল সম্প্রদায়ের মধ্য হতেই তের জন সদস্যের নাম প্রস্তাব করলেন। বলা বাহুল্য, মুসলিম লীগেরও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নাম এর মধ্যে ছিল। জিন্না সাহেব কিন্তু জিদ ধরলেন যে, মুসলমান পাঁচ জন সদস্যই তাঁর তথা মুসলিম

লীগের নির্দ্দিষ্ট পাঁচ ব্যক্তিই হবেন। কিন্তু এই দাবির যুক্তিযুক্ততা নিয়ে দেশের মধ্যে ভীষণ তর্ক সুরু হয়। এবারে স্পষ্টই বুঝা গেল, মুসলিম লীগ ছাড়াও এমন বহু মুসলমান প্রতিষ্ঠান আছে যারা লীগের কর্ম্মপন্থা, বিশেষ করে, ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা পরিকল্পনার ঘোরতর বিরোধী। কংগ্রেসভুক্ত মুসলমান ছাড়াও পঞ্জাবের ইউনিয়নিষ্ট দল জিন্নার দাবি সমর্থন না করে তাঁদের পক্ষীয় একজন সদস্য শাসন-পরিষদে ঐ পাঁচ জনের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এই সব কারণে বড়লাট জিন্নার প্রস্তাব মেনে নিতে পারেন নি, অস্থায়ী জাতীয় শাসন-পরিষদ গঠন না করেই বৈঠক বন্ধ করলেন। তবে এতে প্রকারান্তরে জিন্নার জিদই বজায় রইল। যেরূপ দৃঢ়তার সঙ্গে ওয়াভেল সাহেব কার্য্য সুরু করেছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত সেরূপ দৃঢ়তা দেখাতে না পারায় তিনি তথা ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট সমালোচনার বিষয়বস্তু হয়েছেন।

ওদিকে আমেরিকার সান ফ্রান্সিস্কোতে বিজয়ী রাষ্ট্রবর্গের প্রতিনিধিদের এক সাধারণ বৈঠক সম্প্রতি হয়ে গিয়েছে। এখানে ভারতবর্ষের তথা কংগ্রেসের বেসরকারী মুখপাত্ররূপে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত উপস্থিত থেকে বা'র হস্তেই স্বদেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করেছেন। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী আজ জাতির নমস্য।

মানুষ প্রথমে খোঁজ রাখে ঘরের, তারপর খোঁজ নেয় প্রতি-বেশীর। এ-ই তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু অদৃষ্টের কি পরিহাস! আমরা ঘরের খোঁজ বাধ্য হয়ে যদি-বা কিছু রাখি, প্রতিবেশীর খোঁজ একেবারেই নিই না। তার কথা জানা যে আবশ্যক এ বোধ আমাদের মন থেকে প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে। তেহেরান, লাসা, ব্যাঙ্কক প্রভৃতির কথা জিজ্ঞাসা করলে চোখ রগ্ড়াতে হয়, মনে হয় কোন্ সুদূর অঞ্চলে এসব অবস্থিত। অথচ ইরাণ, তিব্বত, শ্যাম আমাদের একেবারে ঘরের দুয়ারে। আমরা আধুনিক যুগে বিশ্বের সঙ্গে যোগস্থাপন করতে চলেছি, কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো আমাদের নিকট হতে অতি দূরেই রয়ে গেছে!

অতীতে কিন্তু এরূপ ছিল না। ভারতবাসীর দেহ মন ছিল বলিষ্ঠ, উদার, তার দৃষ্টি ছিল বহুদূর-প্রসারী। ভারতীয়

ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করে উত্তরে দক্ষিণে পূর্ব্বে পশ্চিমে দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত হয়েছিল। তিব্বতের পাহাড়-পর্ব্বতসমাকীর্ণ অধিত্যকায় আর মধ্য-এশিয়ার জনবিরল মরুভূমির ফাঁকে ফাঁকে ভারতবর্ষের শিক্ষাদীক্ষা যে শিকড় গেড়েছিল তার নিদর্শন এখনও বহু আছে।

তিব্বতে তো এরূপ নিদর্শন বিস্তর। তিব্বতীদের ধর্ম্ম, সাহিত্য, লিপিমালা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, ললিতকলা প্রত্যেকটির মধ্যেই ভারতীয়দের প্রভাব লক্ষিত হয়। ভারতবর্ষ হতেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথম তিব্বতে প্রচারিত হয় খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে। ভারতক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান হলে বৌদ্ধগণ চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ইস্‌লামের আবির্ভাবের পরই এরা জন্মভূমি থেকে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করে। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে এ দুটি ঘটনার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন রকম যোগ ছিল কি-না জানা যায় না তবে ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীই যে সেখানে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রসারে অবহিত হয়েছিলেন তার বিস্তর প্রমাণ আছে।

ভারতবর্ষ হতে বহু বৌদ্ধ পণ্ডিত ও সাধুসন্ত খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হতে তিব্বতে গমন করতে থাকেন। স্মৃতি, ধর্ম্মপাল, সিদ্ধপাল, প্রজ্ঞাপাল, সুভূতি, শ্রীশান্তি, পদ্মসম্ভব, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ প্রমুখ পণ্ডিতদের নাম তিব্বতীয় ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সঙ্গে বিজড়িত হয়ে আছে। পদ্মসম্ভব ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

অতীশ তিব্বতে পূর্ব্বপ্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্ম সংস্কৃত করে একে নূতন রূপ দান করেন। এঁরা তিব্বতে বিশেষ পূজা পেয়ে থাকেন। দীপঙ্করের নামে তীর্থ ও মঠ রয়েছে, তিনিও তিব্বতে বুদ্ধের অবতার বলে পূজিত।

দীপঙ্করের সম্পর্কে আমাদের বিশেষ গৌরব করবার কারণ আছে। ভুটান ইতিবৃত্ত মতে তিনি ছিলেন বাংলার বিক্রমপুরের অধিবাসী। বিক্রমশিলা বিহারে অধ্যাপনা কালে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তিনি ১০৩৮ খ্রীষ্টাব্দে উনষাট বৎসর বয়সে তিব্বতে গমন করেন। তিব্বতীদের হিতার্থে তাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি, চিন্তা, কর্ম্ম সবই নিয়োজিত হয়। তিনি যে ঐ দেশে এখনও এমন ভাবে পূজা পেয়ে থাকেন তার মূলে রয়েছে তাঁর এই আত্মদান। অতীশ আর স্বদেশে ফিরে আসেন নি। তিব্বতেই তিনি দেহ রক্ষা করেন।

পাহাড়-পর্ব্বত সমাকীর্ণ তিব্বত দীর্ঘকাল পরদেশী মানুষের পক্ষে দুর্গম স্থান বলে পরিগণিত ছিল। এই কারণে এর স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষা করা তেমন কঠিন হয় নি। বৌদ্ধধর্ম্ম ও সংস্কৃতি সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই পুষ্ট হয়। চেঙ্গিস খাঁ ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরম্ভে দিগ্বিজয় মুখে তিব্বতও অধিকার করেন। কিন্তু তখনকার দিনে অন্যান্য দেশের যেমন, তিব্বতেরও তেমনি বিজিত হলেও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বাধীন অস্তিত্ব বিসর্জ্জন দিতে হয় নি।

এই চেঙ্গিস খাঁর বংশধর প্রবল প্রতাপ চীনাধিপতি কুবলাই খাঁর দ্বারা তিব্বত বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়। কুবলাই খাঁ তাঁর রাজসভায় এক তিব্বতী বৌদ্ধভিক্ষুকে আহ্বান করেন। তিনি তাঁর ধর্ম্মব্যাখ্যায় বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং বৌদ্ধধর্ম্ম চীনের রাজধর্ম্ম বলে ঘোষণা করেন। তিনি তাঁর ধর্ম্মগুরুকে তিব্বতের শাসনভারও অর্পণ করেছিলেন। কুবলাই খাঁ ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহধাম ত্যাগ করেন।

কোন্ সময় হতে তিব্বতের বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ লামা নামে অভিহিত হন তা সঠিক জানা যায় নি। 'লামা' শব্দের মানে শ্রেষ্ঠ। কুবলাই খাঁর ধর্ম্মগুরুর স্থলাভিষিক্ত পরবর্ত্তী লামাও রাজদরবারে বিশেষ সম্মানিত হয়েছিলেন। ষোড়শ শতকে চীনসম্রাট্ আলতান খাঁ পঞ্চম প্রধান লামাকে দলাই লামা উপাধি দান করেন। 'দলাই' মানে সমুদ্র। পরবর্ত্তী কালে রাজকীয় ব্যাপারে তিব্বত ও চীনের ভিতর অধিকতর ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয় এবং তিব্বত চীনের একটি প্রদেশ বলে গণ্য হতে থাকে। কিন্তু তিব্বতের আভ্যন্তরিক শাসন এই দলাই লামার দ্বারাই দীর্ঘকাল যাবৎ পরিচালিত হয়ে আস্‌ছে।

লামারা চিরকুমার। কাজেই দলাই লামা বরাবর এক নূতন রকমের 'নির্ব্বাচন' দ্বারাই স্থিরীকৃত হয়ে থাকেন। আধুনিক রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নির্ব্বাচন হতে এর মূলগত পার্থক্য আছে। ত্রয়োদশ দলাই লামার মৃত্যু হয় গত ১৯৩৩ সালে;

ছ'বছর তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধানের পর গত ১৯৩৯ সালে নূতন দলাই লামাকে পাওয়া যায়। দলাই লামার নির্ব্বাচন-ব্যাপার এই ক' বছরে অনেকেরই কৌতূহল উদ্রেক করেছে। এ কতকটা কৌতুককরও বটে। দলাই লামার নির্ব্বাচন-প্রণালী যা দীর্ঘকাল যাবৎ অনুসৃত হয়ে আস্‌ছে, তা কতকটা এইরূপ—

লামাচার্য্য দেহত্যাগ করবার সময় কোন্ গ্রামে ও কোন্ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন তা নির্দ্দেশ করে যেতেন! কিন্তু আজকাল তাঁর নির্ব্বাচন স্বতন্ত্র প্রথায় গৃহীত হয়ে থাকে। মৃত লামাচার্য্য কি নামে অভিহিত হতে পারেন, প্রথমে ১১৭ জন শুদ্ধচেতা লামা একত্র হয়ে তা স্থির করেন। নাম নির্দ্দেশ কালে ভজনা ও পূজা হয়। যতগুলি পবিত্র নাম তাঁদের মনে ওঠে, তাই তাঁরা এক এক খণ্ড কাগজে লিখে একটি স্বর্ণপাত্রে রাখেন, পরে তাঁরা সকলেই স্তোত্র পাঠ করতে করতে ৩১ম হতে ৭১ম দিন পর্য্যন্ত থেকে থেকে এক একখানি কাগজ তুলে নেন্। এ কাগজগুলির ভিতর নব অবতারের নাম পাওয়া যায়। চীন-তিব্বত সীমান্তের এক গ্রাম থেকে একটি শিশুকে বর্ত্তমান দলাই লামা বলে ধার্য্য করা হয়েছে! দলাই লামা নির্ব্বাচন প্রথার ইদানীং আরও কিছু পরিবর্ত্তন হয়ে থাকবে।

লামাচার্য্য শুধু ধর্ম্মগুরু নন্, তিনি চীন-সম্রাটের নিকট হতে তিব্বতের শাসন-কর্ত্তৃত্বও লাভ করেন। এজন্য তাঁর আধিপত্য ক্রমশঃই বেড়ে যায়। তাই তিব্বতে একটি বিশিষ্ট লামা-

সম্প্রদায় গড়ে উঠতে বিলম্ব হ'ল না। কারাকোরাম হতে পিকিং পর্য্যন্ত লামাধর্ম্ম প্রসারলাভ করল। মোঙ্গোলিয়ার সমাজ ও রাষ্ট্রে লামাধর্ম্মের প্রভাব অনুপ্রবিষ্ট হ'ল। লামাধর্ম্মের আদি-ভূমি তিব্বতে লামাচার্য্য দলাই লামা ও তাঁর সহচর অনুচরদের প্রভাব প্রতিপত্তি হয়ে উঠল অসাধারণ। প্রত্যেক পরিবার হতে সন্তানগণ এসে লামা-সম্প্রদায় পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করতে লাগল। শেষ পর্য্যন্ত এরূপ রীতি দাঁড়িয়েছে যে, প্রত্যেক পরিবার হতে জ্যেষ্ঠ পুত্র লামা হতে থাকে। অন্যান্য পুত্রও ইচ্ছা করলে লামা হতে পারে। এরূপে দেখা যায়, বর্ত্তমানে তিব্বতীদের এক-পঞ্চমাংশ পুরুষ অধিবাসী লামা-সম্প্রদায়ভুক্ত। মহিলাও অনেক সন্ন্যাসিনী হয়ে মঠে বসবাস করেন। তাঁদের জন্যও বিস্তর মঠ আছে।

তিব্বতের শাসনভার যেমন লামাদের হাতে ন্যস্ত, তার শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতারও রক্ষক এরাই। তিব্বতের ভিতরে বহু বৌদ্ধ বিহার ও মঠ গড়ে উঠেছে, তাদের সংখ্যা হবে কয়েক হাজার। সেখানে শুধু ধর্ম্মকথাই শিক্ষা দেওয়া হয় না, ঐহিক বিষয়েরও অধ্যয়ন ও চর্চ্চা যথারীতি হয়ে থাকে। তবে সেখানকার শিক্ষা-ব্যবস্থা এখনও প্রাচীন হিন্দু-পদ্ধতির অনুসারী। হিন্দুরা যেমন টোল বা চতুষ্পাঠীতে গুরুর আশ্রয়ে অধ্যয়ন করে থাকে, তিব্বতেও ছাত্ররা সেইরূপ বৌদ্ধবিহার ও মঠে লামার অধীন থেকে নানা বিদ্যা অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করে।

যে গুরু দশ হাজার ছাত্র পোষণ করেন তাঁকে হিন্দুশাস্ত্রে কুলপতি বলে। তিব্বতে কোথাও কোথাও এখনও এই কুলপতি-প্রথা দেখা যায়। সেখানকার কোন কোন বিহারে এখনও দশ হাজার কি তার বেশী ছাত্র একত্রে বাস করে থাকে! তাদের ভরণপোষণ ও পড়াশুনার যাবতীয় ব্যয় বিহারই বহন করে।

ভারতবর্ষ হতে বৌদ্ধধর্ম্ম অন্তর্হিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বহু বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থও বিলুপ্ত হয়। কিন্তু ভারতে বিলুপ্ত বহু মূল্যবান গ্রন্থ মূলে না হোক, অন্ততঃ অনুবাদের ভিতর দিয়ে তিব্বতীতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ থেকে আনীত ধর্ম্ম ও শাস্ত্রগ্রন্থ তিব্বতের লামারা নিজ ভাষায় অনুবাদ করে। মূলের সন্ধান অনেক ক্ষেত্রে না পাওয়ায় ওসব এখন এ অভাব পূরণ করছে, আর মূলের সমানই মান্য বলে দেশ-বিদেশের পণ্ডিতেরা স্বীকার করে নিয়েছেন।

তিব্বতের স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, ললিতকলাও বিহার বা মঠকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এতে ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। এ সব বিষয়ে তিব্বতের লামারা বিশেষ অগ্রণী। ভারতীয় শিল্পরীতি তাঁরা হজম করে নিয়েছেন ও নিজস্ব পদ্ধতির সংযোগে এক নূতন পদ্ধতি সৃষ্টি করেছেন। তিব্বতের কোন কোন মঠ ও বিহারে ভারতীয় রীতির সঙ্গে চৈনিক রীতিও মিশে গেছে।

এই সব মঠ বা বিহার ধর্ম্মচর্চ্চা বা বিদ্যাভ্যাসেরই কেন্দ্র নয়, এক কথায় বলতে গেলে একেই কেন্দ্র করে তিব্বতীদের

সামাজিক জীবনও গড়ে উঠেছে। দলাই লামা ও বিশিষ্ট লামাদের মৃত্যুর দিনে বিভিন্ন বিহারে বিশেষ বিশেষ উৎসব প্রতিপালিত হয়ে থাকে। এই সব উৎসবে সাধারণ গৃহী নর-নারীও সানন্দে যোগ দিয়ে থাকে। হিন্দুর বার মাসে তের পার্ব্বণের মত তিব্বতীদের মধ্যেও বিস্তর পূজা-উৎসব প্রতি-পালিত হয়! তিব্বতীরা অবলোকিতেশ্বরের রীতিমত পূজার্চ্চনা করে। বৌদ্ধধর্ম্মকে স্থানীয় অধিবাসীদের রুচিসম্মত করে অদল-বদল করে নেওয়া হয়েছে। তিব্বতীরা তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জন দেয় নি। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযান শাখার প্রাধান্য। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের মৃত্যু-উৎসব এখনও তিব্বতের বিহারে বিহারে প্রতিপালিত হয়ে থাকে।

ভারতবর্ষের সঙ্গে ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিগত মিল থাকলেও রাজনীতি সম্পর্কে চীনের সঙ্গেই বহু শতাব্দী যাবৎ তার যোগাযোগ। কিন্তু তিব্বতের নৈসর্গিক অবস্থানের বৈশিষ্ট্য হেতু কি ধর্ম্ম-সংস্কৃতি, কি রাজনীতি প্রত্যেকটি ব্যাপারেই তিব্বতীরা স্বাধীনতাপ্রিয় হয়ে উঠে। বিদেশীদের, বিশেষ করে যাদের তারা স্বাধীনতার অপহারক বলে জানত, তাদের কোন মতেই প্রশ্রয় দিত না। এ কারণ কারো কারো কাছে তিব্বত নিষিদ্ধ দেশ ও লাসা নিষিদ্ধ নগরী বলে গণ্য হয়েছিল।

তিব্বত 'নিষিদ্ধ' দেশ কার কাছে? প্রবল-প্রতাপ ইংরেজ

ভারতবর্ষ অধিকার করে চারদিকে এর সীমানা সুরক্ষিত করতে লেগে যায়। সীমানা সুরক্ষিত করা মানে অনেক সময় প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে স্বমতের অনুবর্ত্তি করিয়ে পরিচালিত করা। ভারতের ব্রিটিশ-রাজ এ উদ্দেশ্যে বহুবার তিব্বতে সসৈন্যে অভিযান প্রেরণের চেষ্টা করেছেন। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের টমাস ম্যানিং ইংরেজদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সৈন্যের সাহায্য না নিয়ে একাকী 'নিষিদ্ধ' লাসা নগরীতে প্রবেশ করেন। এর পর ভারতীয় জরীপ বিভাগের তরফেও কেউ কেউ এর অংশবিশেষ জরীপ করেন। কিন্তু রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাসের তিব্বত পরিক্রমাই বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষের সঙ্গে তিব্বতের যোগসূত্র স্থাপনের প্রথম প্রচেষ্টা বলতে হবে। তিনি ১৮৭৯ ও ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তিব্বত পরিভ্রমণ করেন।

এর পর তিব্বতের সঙ্গে ভারতবর্ষের, অথবা সত্য কথা বলতে গেলে ভারতে ইংরেজ-রাজের, ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হতে লাগল। ঊনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের আরম্ভ তিব্বত ও তিব্বতীদের পক্ষে সুখকর হয়েছে কি না ভাবী ইতিহাসকার তার বিচার করবেন। ঐ সময় রুশিয়ার ভারত-আক্রমণ সম্বন্ধে ব্রিটিশ-রাজ মনে আশঙ্কা পোষণ করছিলেন। জনৈক রুশীয় পরামর্শদাতা দলাই লামার দরবারে তখন নাকি বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে। ইংরেজরা এটি মোটেই ভাল চোখে দেখে নি। ভারতের তৎকালীন

বড়লাট লর্ড কার্জ্জন ১৯০৪ সালে প্রসিদ্ধ ভূগোলবেত্তা ও হিমালয়-পর্ব্বতমালা অভিযানকারী সার্ ফ্রান্সিস ইয়ংহাস্‌ব্যাণ্ডের নেতৃত্বে মিলিটারি মিশন বা সামরিক অভিযানকারী দল প্রেরণ করেন। তিব্বতীরা তাঁদের অগ্রগতিতে বাধা দিলে উভয় দলে কিছু যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে তিব্বতীরা বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারে নি। এই বছরই ৭ই সেপ্টেম্বর উভয়ের মধ্যে কয়েকটি শর্ত্তে সন্ধি স্থাপিত হ'ল। রাষ্ট্রনীতির দিক্ থেকে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শর্ত্ত হ'ল—তিব্বতে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের বৈষয়িক বা বাণিজ্যিক কোনরকম সুবিধাই থাকবে না।

এর পরে ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক আকাশে জার্ম্মান শক্তির অভ্যুদয় হলে ব্রিটিশ ও রুশিয়ার মধ্যে হৃদ্যতা হতে থাকে। সুতরাং দুয়ের ভিতর তিব্বত সম্পর্কেও একটা চুক্তি হয়। এতে স্থির হয় যে, লাসা নগরীতে কি রুশিয়া কি ব্রিটেন কারো তরফে কোন প্রতিনিধি থাক্‌বে না। ১৯০৯ সালে তিব্বত সম্পর্কে চীনের সঙ্গেও ইংরেজের এক চুক্তি হ'ল। এতে চীন অন্য কোন রাষ্ট্রকে তিব্বতের কোন অংশ ইজারা বা বিক্রয় করতে পারবে না স্থির হয়। তিব্বতের সঙ্গে ব্রিটনের অবাধ-বাণিজ্য স্থাপন ও তিব্বতের শান্তি-রক্ষা এ দুটি বিষয়ও চুক্তির অঙ্গীভূত হ'ল।

তিন বছর পরে ১৯২২ সালে যখন তিব্বত ও চীনের মধ্যে নূতন করে সংঘর্ষ বাধে তখন তিব্বতের শাসন কর্ত্তা দলাই লামা দার্জ্জিলিঙে এসে ইংরেজ-রাজের আশ্রয় নেন্। ব্রিটিশ

সরকার তাঁর প্রতি তখন তাঁর পদমর্য্যাদার অনুরূপ সম্মান প্রদর্শন করেন। ব্রিটিশ সরকারেরই মধ্যস্থতায় চীন তিব্বতে আর বেশী দূর অগ্রসর হয় নি। পরে ১৯১৩ সালের অক্টোবর মাসে ব্রিটেন, চীন ও তিব্বতের প্রতিনিধিরা সিমলায় একটি শান্তিবৈঠকে মিলিত হয়ে কতকগুলো প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এ সব কিন্তু বরাবর গোপনীয়ই রাখা হয়। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, চীনের সরকার এ বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবগুলি কখনো সমর্থন করতে পারেন নি। চীনের তিব্বত আক্রমণের ফলেই এবারে ইংরেজ তিব্বতে বেশী করে সুবিধা করে নেবার সুযোগ পেলে।

ইউরোপে যখন প্রথম মহাসমর বাধে, তখন তিব্বত প্রচুর সৈন্য ও রসদ দিয়ে ইংরেজকে সাহায্য করে। এ সময় থেকেই প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে তিব্বতের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হতে থাকে। এতদিন তিব্বত-সরকার কোন ইংরেজকে পরামর্শদাতা রূপে গ্রহণ করেন নি। যুদ্ধের পরে সার চার্লস বেল প্রথম এই পদ নিয়ে তিব্বতে যান। তিব্বত ও ভারতবর্ষের মধ্যে টেলিগ্রাফ বা তারযোগে সংবাদ আদান-প্রদানেরও প্রথম ব্যবস্থা হয় ১৯২২ সালে।

লাসা এখন আর নিষিদ্ধ নগরী নয়, তিব্বতেরও এখন আর এ অপবাদ নাই। ব্রিটিশ বাণিজ্যের দৌলতে বিবিধ বিলাসের সামগ্রী ভিক্ষু লামার দেশেও প্রবেশ করেছে। বিদেশী বস্ত্রাদি

তাদের নিকট এখন আর নূতন জিনিষ নয়। রেডিওর মারফৎ দৈনন্দিন বিশ্বের সংবাদ এখন সে জেনে নেয়। তিব্বতের ধনী পরিবারের ছেলেরা বিদেশে, ভারতবর্ষে ও অন্যত্র আধুনিক শিক্ষা লাভের জন্য গমন করে থাকে। লামার শাসনেও কিছু কিছু সংস্কার সাধিত হয়েছে। একজন মন্ত্রী তাঁর আছেন। শাসন-ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ বিশেষ আবশ্যক। তিব্বত নামে মাত্র চীনের অধীন হলেও বর্ত্তমানে ব্রিটিশের দ্বারাই প্রভাবান্বিত। তিব্বত-সরকার এভারেষ্ট-শৃঙ্গ আরোহনকারীদের এখন শুধু অনুমতি দিয়ে ক্ষান্ত নন্ লামাদের দ্বারা তাঁদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য প্রশস্তিও করিয়ে থাকেন।

—এক—

শ্যাম

ভারতবর্ষের পূর্ব্বে ও পশ্চিমে কয়েকটি স্বাধীন দেশ রয়েছে। আজকের জগতের সঙ্গে সমান তালে চলবার জন্য তারা চেষ্টাও করছে অবিরত। চীন ভারত-সীমান্তের একটি দেশ, কিন্তু তার কথা এখন বলব না। ভারতবর্ষের পূর্ব্বে আর একটি স্বাধীন দেশ হচ্ছে শ্যাম, আর পশ্চিমে হচ্ছে আফগানিস্তান ও ইরাণ বা পারস্য। এদের কথাই এখন তোমাদের বলব।

'বৃহত্তর ভারত' এই কথাটি তোমরা হয়ত অনেকেই শুনেছ। আগেকার দিনে ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন ছিল তখন তার শিক্ষা, সভ্যতা. ধর্ম্ম, বাইরে—দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর নানা স্থানে এর নিদর্শন আজও আমরা পাই। তিব্বতের মত, পূবের দেশগুলিতে ভাষায়, সাহিত্যে ও লোক-

জনের আচার-ব্যবহারে ভারতীয় ছাপ এখনও স্পষ্ট দেখতে পাবে। সেখানকার প্রাচীন শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ভারতীয় রীতির অনুসারী। মন্দির ও মূর্ত্তি দেখ্‌লে ভারতীয় বলে ভ্রম হবে! শ্যামেও এসব রয়েছে বিস্তর। এখানকার অধিবাসীদের আদিত্য, রামচন্দ্র, মনুধর্ম্ম ইত্যাদি নামগুলি খাঁটি সংস্কৃত। শ্যামের কথ্য ভাষা পালি আর বেশীর ভাগ লোকই বৌদ্ধ। রাজাও তথাগতেরই উপাসক।

শ্যামের লোকেরা এ দেশটির নাম দিয়েছে ইদানীং 'থাইল্যাণ্ড'। থাই মানে যারা স্বাধীন, মুক্ত। কাজেই থাই-ল্যাণ্ড মানে হবে 'স্বাধীন লোকের দেশ' ; শ্যাম তার বাসিন্দা-দেরই দেশ, অন্য কারো নয়। এ দেশটি আজ ছ'শ বছর ধরে একাদিক্রমে স্বাধীন রয়েছে। চীন থেকে ইরাণ—এই দীর্ঘ পথে একমাত্র শ্যামই স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করে রেখেছে।

শ্যাম একটা বড় দেশ নয়, আয়তনে আমাদের বাংলা, বিহার আসাম এই তিনটী প্রদেশ জুড়লে যতখানি হয় ঠিক ততখানি। অথচ এর লোকসংখ্যা খুবই কম—মাত্র দেড় কোটি! তবে শ্যামের অর্দ্ধেকটাই বন জঙ্গলে ভরা। এই জঙ্গলে এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত জীব আছে যার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য দূর-দূরান্তর থেকে এখানে লোক আসছে—আর বছরের পর বছর কাটিয়ে দিচ্ছে।

শ্যামের শাসন ব্যাপারে একটা বড় রকমের পরিবর্ত্তন ঘটেছে

মাত্র কয়েক বছর আগে—গত ১৯৩২ সালে। এর ঢের আগে থেকেই কিন্তু শ্যামবাসীরা এর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। গত শতাব্দীর শেষ ভাগে ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের ঢেউ এসে এর তীরে পৌঁছে। রাজা মহাচুলালংকর্ণ তখন শ্যামের রাজা। তিনি ছিলেন চক্রী রাজবংশীয়। ১৮৬৮ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত এখানে তিনি রাজত্ব করেন। চুলালংকর্ণ জবরদস্ত রাজা। একদিকে তিনি ইংরেজ-ফরাসী দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে নিজের স্বাধীনতা অটুট রেখেছিলেন,—যদিও বিদেশীদের কিছু কিছু অধিকার তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল ; অন্যদিকে দেশের রেলপথ বিস্তার, ডাক ও তার বিভাগ স্থাপন এবং শিক্ষা সংস্কারে মন দিয়েছিলেন। সরকারী অর্থে শ্যামবাসী যুবকদের লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন প্রভৃতি বড় বড় শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠানও সুরু হয় এই সময় থেকে।

রাজা চুলালংকর্ণের অনেকগুলি বিয়ে। তাঁর মৃত্যুর পর প্রথম রাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র 'রাজা ষষ্ঠ রাম' এই নাম নিয়ে শ্যামের রাজা হলেন। ১৯১০ থেকে ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। রামচন্দ্র লোকটি ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি সেক্সপীয়ারের নাটক শ্যামের ভাষায় অনুবাদ করেন। নিজেও নাটক লিখ্‌তেন আর অভিনয় করতেন। শাসনকার্য্যে তাঁর আদৌ মন ছিল না। রাজা চুলালংকর্ণের ছেলেও অনেকগুলি। কা'র পর কে রাজা হবেন তা তিনি ঠিক করে দিয়ে যান। ষষ্ঠ

রামদেবের পর রাজা হওয়ার কথা ছিল তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই মহীদলের। মহীদল রাজসিংহাসনের কখনো প্রত্যাশী ছিলেন না। তিনি আমেরিকার হার্ভার্ড ও জন হপ্‌কিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা বিদ্যা শিখেছেন। এখন তিনি নিউ ইয়র্কের আল্‌বানিতে চিকিৎসা ব্যবসা করছেন। একজন সাধারণ শ্যামদেশীয় যুবতীর পাণিগ্রহণ করে সেখানেই রয়ে গেছেন। শ্যামের ভাবী রাজা আনন্দ মহীদল এঁরই পুত্র! আনন্দ কেমন করে রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হলেন তাই তোমাদের এখন বল্‌ছি।

রাজ ষষ্ঠ রামের মৃত্যুর পর যখন মহীদল আর দেশে ফিরে এলেন না তখন তাঁরই কনিষ্ঠ প্রজাধিপক শ্যামের সিংহাসন পেলেন। ১৯২৫ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি এখানে রাজত্ব করেন। শেষোক্ত সালে তিনি রাজ-মসনদ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। রাজা প্রজাধিপক এখন ইংলণ্ডের সারে নামক স্থানে নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করছেন। এঁর সময়েই শ্যামের শাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে। রাজা প্রজাধিপক উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত। তিনি রাজা চুলালংকর্ণের প্রগতিমূলক ব্যবস্থা সবই বাহাল রাখলেন, আবার দেশের ধনসম্পদ বাড়াবার জন্য নানারূপ উপায়ও করে নিলেন। বিদেশীরা শ্যামে নানা রকম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। ইংরেজীতে এক কথায় একে বলে "ক্যাপিটুলেশন"। কোন বিদেশী যদি কোন রকম অপরাধ করত তা'হলে তার বিচার হ'ত তাদের স্থাপিত বিচারালয়ে।

শ্যামরাজ্যে বসে শ্যামের আদালতে এদের বিচার হ'ত না। এ বিসদৃশ ব্যবস্থা যে শুধু শ্যামে ছিল তা নয়, চীন, ইরাণ, তুর্কী প্রাচ্যের প্রায় সব স্বাধীন দেশের এই ব্যবস্থা কমবেশী বিদ্যমান ছিল। এ প্রথা একে একে এখন প্রায় সব দেশে থেকেই লুপ্ত হয়েছে। শ্যামেও এখন এই প্রথা নেই।

এই শতাব্দীর প্রথম থেকেই শ্যামবাসীদের ভিতর শিক্ষা দ্রুত প্রসারিত হতে থাকে। বিদেশে ছাত্র ও যুবক পাঠাবার কথা তোমাদের বলেছি। কেউ যুদ্ধবিদ্যা, কেউ আইন, কেউ অর্থনীতি—এই রকম নানা বিদ্যা আয়ত্ত করে আর দেশ-বিদেশের নূতন নূতন ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে যুবকদল দেশে ফিরতে লাগ্‌ল। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র প্রায় সব দেশ থেকেই উঠে গেছে। যেখানে রাজা বিদ্যমান সেখানেও সাধারণের মত অনুযায়ী তাঁকে চল্‌তে হয়। সাধারণের মতামত নেওয়া হয় তাঁদের প্রতিনিধি সভা মারফত। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শ্যামের যুবকদল নিজেদের দেশে এইরূপ শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তন করতে চাইলে। তারা দেশে ফিরে সরকারের বিভিন্ন বিভাগে নিয়োজিত হ'ল। নৌ-বিভাগ, সৈন্য-বিভাগ, পুলিস-বিভাগ, শিক্ষা-বিভাগ, শাসন-আইন-আদালত বিভাগ সকল বিভাগেই এরা ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু এর অধিকাংশেই কর্ত্তৃত্ব করতে লাগল রাজপরিবারের লোকেরা। তারা ছিল আইন-কানুনের বাইরে, আর তাদেরই উদরপূর্ত্তি করতে রাজস্বের বেশীর ভাগ

টাকা ব্যায় হয়ে যেত। তাই গত ১৯৩২ সালে নব-শিক্ষিত কর্ম্মচারী যুবকদল বিপ্লব উপস্থিত করলে।

এ বিপ্লবে কিন্তু একটি প্রাণও নষ্ট হয় নি। তোমরা ইতিহাসে অনেক 'রক্তহীন বিপ্লবে'র (ব্লাড্‌লেস্ রিভলিউশন) কথা পড়বে। এ বিপ্লবও তেমনি একটি। রাজপরিবারের লোকেরা একে একে এদের হাতে বন্দী হ'ল। রাজা প্রজাধিপক তখন রাজধানী ব্যাঙ্ককে ছিলেন না। তিনি বিপ্লবের সংবাদ পেয়ে রাজধানীতে ছুটে এলেন। তিনি প্রথমে নিজে সব পরখ করে দেখলেন, পরে বিপ্লবীদের তৈরী শাসন ব্যবস্থার খসরায় সহি করলেন। লোকে রাজাকে ধন্য ধন্য করতে লাগ্‌ল। রাজার তখন এ না করে উপায়ও ছিল না। তথাপি তিনি যে একজন প্রগতিশীল রাজা ছিলেন তা তোমাদের বল্‌তেই হবে।

এর পর ১৯৩২ ও ৩৪ সালে দুটো ছোটা-খাটো বিপ্লব হয়। ছোট-খাটো হলেও শেষোক্তটা খুবই মারত্মক হয়েছিল। চৌত্রিশ সালের বিপ্লব ছিল বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে। পুনরায় স্বৈর-শাসন প্রবর্ত্তনের জন্য রাজপরিবারের লোকেরা এবং দেশের সম্ভ্রান্ত ও বড়লোকেরা এক যোগে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়ে যায়। বিচারে এদের কয়েকজনের ফাঁসির হুকুম হ'ল। কারো ফাঁসি দিতে হলে রাজারও সম্মতি নিতে হয়। যখন শেষোক্ত বিপ্লব ঘটে তার আগেই রাজা প্রজাধিপক বিলাতে চোখের চিকিৎসা

করাতে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে এ বিপ্লবের যোগ ছিল না। তথাপি তিনি ওদের ফাঁসির হুকুমে সম্মতি দেন নি, এর বদলে ডাকযোগে তাঁর সিংহাসন ত্যাগের কথা শাসন-পরিষদকে জানিয়ে দিলেন। শ্যামের শাসন পরিষদ মহীদলের পুত্র বালক আনন্দ মহীদলকে ভাবী রাজা বলে ঘোষণা করলেন।

আনন্দ মহীদল ১৯২৫ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। আনন্দ সুইজারলণ্ডে শিক্ষা লাভ করেছেন। তাঁর জন্ম বিদেশে, মাত্র ১৯৩৮ সনের নবেম্বর মাসে প্রথম শ্যামে গিয়েছিলেন। ষোল বছর পূর্ণ হলে তাঁর সিংহাসনে আরোহণ করার কথা ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর হয়ে এক রাজ পরিষদ কাজ চালান। ১৯৩২ সালের বিপ্লবের পরে যে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয় তাতে সাধারণের ক্ষমতাই প্রবল হয়ে উঠেছে। রাজা না থাক্‌লেও দেশ-শাসনে ব্যাঘাত ঘটবার সম্ভাবনা নেই। নূতন শাসনতন্ত্র গণতন্ত্রের আদর্শে রচিত। সরকারের সকল ক্ষমতার উৎস হ'ল সমগ্র শ্যামজাতি, আর রাজা হলেন জাতির প্রতিভূ বা মুখপাত্র। ইংলণ্ডের রাজার যে ক্ষমতা, এঁর ক্ষমতাও প্রায় তদ্রূপ। পার্লামেণ্ট বা ব্যবস্থা-পরিষদই এখানে সর্ব্বেসর্ব্বা। শ্যামে রাজস্বের বিলি-বন্দোবস্ত, বিভিন্ন দেশের মধ্যে সন্ধিবিগ্রহ, শাসনের সকল রকম আয়োজন, আইন প্রণয়ন,—এ সকলই ব্যবস্থা-পরিষদের মত নিয়ে মন্ত্রিসভা সম্পাদন করেন। ব্যবস্থা-পরিষদের অর্দ্ধেক সদস্য মন্ত্রিসভার পরামর্শ মত রাজা মনোনীত

করেন, আর অর্দ্ধেক হন জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত। চার বছর অন্তর নূতন নির্ব্বাচন হয়। দশ বছর পরে সকল সদস্যকেই জনসাধারণ নির্ব্বাচন করবে। 'পিপল্‌স পার্টি' বা গণ-দল এখন শ্যাম শাসন করছে বলা যেতে পারে। চীনের কুমিণ্টাং দলের মত এই দল দেশের শাসন ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব করে। ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচনে ভোট দেবার অধিকারী কুড়ি বছর বা তদূর্দ্ধ সকল সাবালক নর-নারী। শ্যামের জননায়করা বলেন, সাধারণ লোকেরা এ ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হলে এও একটী পুরোপুরি গণতন্ত্রে পরিণত হবে, যদিও ইংলণ্ডের ন্যায় রাজাকেও তাঁরা স্বীকার করে নেবেন।

শ্যামের রাষ্ট্রীয় চেহারা এই অল্প দিনের ভিতরেই বদলে গেছে। রাজনীতির দিক দিয়ে জনগণ এখন মুক্ত। অর্থনীতির দিক দিয়ে তাদের মুক্ত হতে এখনও কিছু বিলম্ব আছে বলে মনে হয়। জমির খাজনা সম্পর্কে এক এক জায়গায় এক এক নিয়ম, বিলি-ব্যবস্থা সম্বন্ধেও কোন নির্দ্দিষ্ট মান নেই। রাষ্ট্রনেতারা এখন এসব দিকে মন দিয়েছেন। শ্যামে ধান হয় প্রচুর। এখানকার ধনসম্পদ বাড়াবারও চেষ্টা চলছে খুব। শ্যামের দ্বার এতদিন সকলের নিকটেই মুক্ত ছিল। তোমরা শুনে সুখী হবে, বিদেশীদের ভিতর বাঙালীও এখানে কিছু কিছু রয়েছে। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যও করছে। এখানে চীনা ব্যবসায়ীর সংখ্যা খুব বেশী। তবে জাপানীদের ব্যবসা-বাণিজ্যও এখানে কম নয়।

ক্রমে জাপানীদের প্রভাব শ্যামে খুবই বেড়ে যায়। রাজা প্রজাধিপকের আমল পর্য্যন্ত ইংরেজ প্রভাব শ্যামে বলবৎ ছিল।

শ্যামের অন্যতম নেতা লুয়াং প্রজিৎ মনুধর্ম্ম একটি ব্যাপক পরিকল্পনা প্রবর্ত্তন করে স্বদেশের দৈন্যদশা ঘুচাবার চেষ্টা করছেন। শ্যামবাসীরা যাতে বেশীর ভাগ শিল্প ও ব্যবসা করতে বাধ্য হয় আইন করে তাই করবার চেষ্টা চল্‌ছে। তারা বিদেশীদের উপর নির্ভরশীল হবে না স্থির করেছে।

শ্যামের সঙ্গে অন্যান্য দেশের সম্পর্ক কি, আর আত্মরক্ষার জন্য ব্যবস্থাই বা সে কি করেছে তা আমাদের এখন জানতে হবে। শ্যাম ছোট দেশ, ধনসম্পদ আহরণের ব্যবস্থা এখনও তেমন হয় নি। কৃষিই এখন পর্য্যন্ত লোকের প্রধান জীবিকা। শিল্প বা বাণিজ্য তাদের তেমন বাড়ে নি। এজন্য প্রয়োজন-মাফিক অর্থের সেখানে বড়ই অভাব। তারা বিদেশ থেকে ঋণ নিতেও ভরসা পায় না। ঋণ-দাতারা অনেক ক্ষেত্রেই ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোয়। অনেক দেশ এভাবে স্বাধীনতা হারিয়েছে।

অর্থাভাব হলেও শ্যাম দেশ-রক্ষার আয়োজন করতে ভোলে নি। এখানে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা বাধ্যতামূলক, প্রত্যেক সমর্থ লোককেই যুদ্ধবিদ্যা শিখতে হয়। এজন্য বেতনভোগী স্থায়ী সৈন্য পঁচিশ ছাব্বিশ হাজার থাক্‌লেও আপৎকালে সাধারণ লোকেরাও যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে; তারা এখন মজুত বা

'রিজার্ভ' আছে। শ্যামে একটি বিমান-বাহিনীও গঠিত হয়েছে, এতেও প্রায় আড়াই হাজার লোক নিযুক্ত। এদেশটির নৌ-বাহিনীও আছে। যুদ্ধ-জাহাজ জাপান ও ইটালী থেকে কিনে নেয়। টর্পেডো, ডেষ্ট্রয়ার, সাব্‌মেরিন প্রভৃতি মিলে প্রায় চল্লিশ খানা জাহাজ এর আছে। শ্যামের দেশ-রক্ষার আয়োজন ক্রমে বেড়েই চলে।

বিদেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? শ্যামের প্রধান মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী কখনও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, কখনও বা একযোগে পররাষ্ট্র-নীতির ব্যাখ্যা করে থাকেন। কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁরা বলেছিলেন, শ্যামদেশ হবে এশিয়ার 'সুইজারলণ্ড'। ইউরোপে অত বড় মহাসমর হয়ে গেল, কিন্তু এর ভিতর সুইজারলণ্ডের নামটি পর্য্যন্ত কেউ শোনে নি। পরে যখন শান্তি স্থাপিত হ'ল, রাষ্ট্র-সংঘ গঠিত হ'ল, তখন এর নাম শোনা গেল; কেননা বিরুদ্ধ দেশগুলির মিলন স্থল হ'ল এই সুইজারলণ্ড। শ্যাম-বাসীরাও মনে করেছিল, তাদের দেশটি সুইজারলণ্ডের মতই নিরপেক্ষ থেকে এশিয়ায় শান্তির পতাকা বইতে থাকবে। এজন্য নূতন শাসন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিদেশীদের সঙ্গে তার সম্পর্কের রদ-বদল হয়। কোন রাষ্ট্রকে বিশেষ খাতির করতে সে আর চায় নি। ১৯৩৬ সালের পর থেকে সকলের সঙ্গেই নূতন করে সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা চলে। তবে অনেকের কিন্তু বিশ্বাস ছিল, শ্যামের শাসনকর্ত্তারা মুখে যাই বলুন, এ দেশটি

আস্তে আস্তে জাপানের আওতার মধ্যেই এসে পড়বে। শ্যামের দেশ-রক্ষা মন্ত্রী কর্ণেল লুয়াং বিপুলসংগ্রাম মুসোলিনীর ফাসি-বাদে বিশ্বাসী। জাপানের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপনে তিনি উৎসুক ছিলেন। এই দ্বিতীয় মহাসমর কালে এ কথা সত্যে পরিণত হয়েছে।

তোমরা মানচিত্রে দেখেছ, ব্রহ্মদেশের নীচুতে একটা সরু ফালি বরাবর দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। এর শেষ প্রান্তে রয়েছে সিঙ্গাপুর। মাঝখানে খানিকটা শ্যামের অধীন, বাকী সবটাই ইংরেজদের। শ্যামের অধীন ঐ জায়গাটার সব চেয়ে সরু অংশকে 'ক্রা' যোজক বলে। এই যোজকটি মাত্র তেত্রিশ মাইল লম্বা। আমেরিকার পানামা খাল কেটে যেমন অতলান্তিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে যোগসাধন করা হয়েছে, এ যোজকটিতেও খাল কেটে প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহা-সাগরের মধ্যে যোগ স্থাপন করার প্রস্তাব চলে বহু দিন ধরে। এরূপ হলে দুদিকে যাতায়াতের সুবিধা হবে, ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়বে, শ্যামের উন্নতিও হবে খুব ; পথও ঢের কমে যাবে। চীনের যে-কোন বন্দর ও কলকাতার ভিতর জলপথ ছ'শ বাট মাইল কমবে, আর ব্যাঙ্কক-রেঙ্গুনের পথ কমবে তের শ' মাইল। কিন্তু একটা কারণে ও প্রস্তাবে অনেকের, বিশেষ করে ইংরেজের, মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। এখানে খাল কাটা হলে সিঙ্গাপুরের উপর টেক্কা দিয়ে জাপানের পক্ষে শ্যামের সাহায্যে ব্রহ্মদেশে ও ভারতবর্ষে সৈন্য, নৌবহর, বিমানপোত অতি সহজে পাঠানো

সম্ভব। সুতরাং ইংরেজ যে অজস্র টাকা ব্যয় ক'রে ভারত মহাসাগরে ঢোকবার পথে সিঙ্গাপুরকে সুরক্ষিত করলে সে-সবই ব্যর্থ হবার উপক্রম হবে। তাই এই খাল কাটার প্রস্তাব নিয়ে কিছুকাল খুবই লেখালেখি ও বাদানুবাদ চলে। এর পর ক্রা যোজকে খাল কাটার কথা আর উঠে নি। ক্রা যোজকের পশ্চিম প্রান্তে যেখানে ব্রহ্মদেশ শেষ হয়েছে সেখানে (নাম ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট) ইংরেজ একটি বিমানঘাঁটি প্রস্তুত করে রেখেছিল।

ইউরোপে মহাসমর আরম্ভ হলে জাপান ব্রিটেনের শত্রু জার্ম্মানী ও ইটালীর সঙ্গে একটি সামরিক চুক্তি করে। তখনই সাধারণের মনে আশঙ্কা জন্মে যে, সুযোগ বুঝে এশিয়ায় জাপানও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হবে। জাপান শ্যামের সঙ্গে সন্ধিতে আবদ্ধ হয় ও বিগত ১৯৪১ সালে ডিসেম্বর মাসে তাকেই ভিত্তি ক'রে মালয়, সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশে আক্রমণ চালাতে আরম্ভ করে। শ্যামের কর্ত্তৃপক্ষ সৈন্য ও রসদ দিয়ে জাপানী বাহিনীকে এ সময় বিশেষ সহায়তা করে। বর্ত্তমানে জাপান যে ঐ সব অঞ্চলে আড্ডা গেড়ে বসে আছে তার মূলেও শ্যামের সাহায্য কম নয়। কর্ত্তৃপক্ষের এই সব কার্য্যে শ্যামের জনসাধারণের কতটা সম্মতি ছিল তা আজ জানবার উপায় নেই। তবে একথা ঠিক যে সুইজারল্যাণ্ডের নিরপেক্ষতার সুনাম শ্যাম আজ আর দাবি করতে পারছে না। প্রাচ্যের যুদ্ধ অন্তে তার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াবে ঠিক করে বলা এখন আর সম্ভবপর নয়।

—দুই—

আফগানিস্তান

ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সীমায় যেমন শ্যাম ও চীন, পশ্চিম সীমান্তে তেমনি আফগানিস্তান ও ইরাণ। তোমরা কলকাতার অলি-গলিতে, এমন কি পল্লীর পথে-ঘাটেও ঢের কাব্‌লিওয়ালা দেখ্‌তে পাও। এরা আফগানিস্তান থেকে এসেছে টাকা রোজগারের জন্য। কাব্‌লিওয়ালা কথাটাই যেন লোকের প্রাণে আতঙ্ক জন্মায়। এরা বড়ই সুদখোর ; যারা এদের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করে, তারা ধার শোধ দিতে নাস্তা-নাবুদ হয়ে যায়। সুদখোর অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন বলে কাব্‌লিওয়ালারা সাধারণের কাছে মোটেই শ্রদ্ধা বা সম্মান পায় না। তবে এরাও কিন্তু একটা স্বাধীন জাত, ছোট বড় সকল স্বাধীন দেশের মত এরা নিজেরাই দেশ শাসন করে থাকে। বিদেশীদের কোন কারসাজী এখানে চলে না। আফগনিস্তানে এদের বাস। এদেশটি আজ নানাদিকে অনেকটা অগ্রসর হয়েছে।

কাব্‌লিওয়ালা নামটি এসেছে আফগনিস্তানের রাজধানী কাবুল থেকে। তবে তোমরা যাদের দেখতে পাও সকলেই যে কাবুল থেকে এসেছে তা নয়, আফগানিস্তানের নানা জায়গা

থেকেই এরা এসেছে। এরা জাতিতে আফগান বা পাঠান, আর এ নাম থেকেই হয়েছে দেশটির নাম আফগানিস্তান। ভারতবর্ষের সঙ্গে এ দেশটীর যোগ বহু দিনের। মোগল আমলে এ ভারতের অধীন হয়। হিন্দু সভ্যতাও এখানে একদিন প্রসার লাভ করেছিল। এর নিদর্শন গান্ধার প্রভৃতি নানা স্থানে বিস্তর রয়েছে। এ জাতটি বড়ই স্বাধীনতাপ্রিয়। মোগল যুগে ভারতবর্ষের অধীনে এরা বেশী দিন থাকে নি। ইংরেজরাও এখানে বিশেষ মাথা গলাতে পারে নি। তারা কিন্তু একে নিজ তাঁবে রাখতে চেয়েছিল অন্যভাবে। অন্য কোন বিদেশীর সঙ্গে এর বিশেষ মাখামাখি যাতে না হয় এই ছিল তাদের লক্ষ্য। এক কথায় আফগানিস্তানের বৈদেশিক নীতি তারাই পরিচালিত করতে চেষ্টা করত। আগেকার দিনে ইংরেজের ভয় ছিল যে, আফগানিস্তানের পথে রুশ এসে ভারতবর্ষ আক্রমণ করবে। এজন্য তারা ঐ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল আরও বেশী করে। তারা আফগান-সরকারকে বছরে কয়েক লক্ষ টাকা করে খাজনাও দিত।

আফগানরা গত যুদ্ধের পর পররাষ্ট্র-নীতি সম্পর্কে মুক্ত হতে চেয়েছিল। আমীর আমানুল্লা এজন্য ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধও করেন। এর পরে ১৯১৯ সালে আফগানিস্তান ও ব্রিটেনের মধ্যে যে সন্ধি হয় তাতে আমানুল্লা খুবই সুবিধা করে নিলেন। তখন রুশিয়ায় বিপ্লব দেখা দিয়েছে,

আফগানিস্তান

আফগানিস্তানের পথে ভারতবর্ষ আক্রমণের সম্ভাবনা আর নেই। একারণ তার বৈদেশিক নীতিতে স্বাতন্ত্র্য ইংরেজ স্বীকার করে নিলে। আমানুল্লা ইংরেজের নিকট হতে বার্ষিক খাজনা নেওয়াও বন্ধ করে দিলেন। আফগানিস্তানের শাসনকর্ত্তাকে আগে 'আমীর' বলা হত, আমানুল্লা এ সময় থেকে 'রাজা' বা শাহ্ উপাধি গ্রহণ করলেন। আফগানিস্তান ইংরেজের প্রভাব মুক্ত হয়ে স্বতন্ত্রভাবে চল্‌তে সুরু করলে।

আমানুল্লা বৈদেশিক নীতিতে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে নিজ ইচ্ছামত চল্‌তে আরম্ভ করলেন। যে রুশ ছিল এতকাল ইংরেজের পক্ষে জুজু, তার সঙ্গেই তিনি একটি বন্ধুত্বমূলক সন্ধিতে আবদ্ধ হলেন! রুশ কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণের তখন আর ভয় ছিল না। কিন্তু ইংরেজের আশঙ্কা হ'ল রুশিয়ায় সাম্যবাদ প্রবল, আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে ভারতে তা কোনক্রমে আমদানী হয়ে না পড়ে। রুশ প্রভাব ওখানে যতই বাড়তে লাগল, ইংরেজও ততই হুসিয়ার হয়ে চল্‌ল। আমানুল্লা এর পর ইরাণ ও তুরস্কের সঙ্গে সন্ধি করলেন। তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক ও ইরাণের রেজা শাহ্ পহ্লভী নিজ নিজ দেশের উন্নতির জন্য যে-সব উপায় অবলম্বন করেছেন তিনিও তার কিছু কিছু এখানে প্রবর্ত্তন করতে চাইলেন। ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা নানা বিষয়ে সংস্কার-সাধনের চেষ্টা করলেন। তিনি নারীর অবরোধ প্রথা তুলে দিলেন, শিক্ষা লাভের জন্য আফগান যুবক-

যুবতীদের বিদেশে—ইউরোপ ও আমেরিকায় পাঠালেন। রাণী সুরাইয়া (ভুল করে বলা হয় 'সৌরিয়া') প্রকাশ্যে বার হতেও লজ্জিত হলেন না। স্বদেশে এই সব নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করে পত্নীকে নিয়ে আমানুল্লা ইউরোপ ভ্রমণে বার হলেন। রোম, প্যারিস, লণ্ডন, বার্লিন সর্ব্বত্র তিনি বিপুল সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা পেলেন। কিন্তু এই ইউরোপ ভ্রমণই হ'ল তাঁর পক্ষে কাল। আমানুল্লা এক বৎসর মাত্র বিদেশে ছিলেন। এই সময় গোঁড়া মোল্লা মৌলভীরা আফগানিস্তানের সর্ব্বত্র তাঁর বিরুদ্ধে প্রচার সুরু করে দিল। কোন বিদেশী শক্তি—অনেকের মতে ইংরেজ—এদের টাকা জুগিয়ে ও পত্রপত্রী ছাপিয়ে দিয়ে সাহায্য করে। আমানুল্লা আফগানিস্তানে পৌঁছতেই বিদ্রোহ সুরু হ'ল ; তিনি শত চেষ্টা করেও বিদ্রোহ দমন করতে পারলেন না। অবশেষে ১৯২৯ সালে পত্নীকে সঙ্গে করে তিনি দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন এবং তদবধি ইটালীর একটি নিভৃত পল্লীতে নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করতে থাকেন।

বাচ্চাই সাক্কা নামে এক ভিস্তিওয়ালা কাবুলের রাজ-সিংহাসনে বসেছিল কয়েকদিন। ইতিমধ্যে নাদির খাঁ নামে রাজ-পরিবারের এক ব্যক্তি প্যারিস হতে তাড়াতাড়ি চলে এলেন বিদ্রোহীদের কবল থেকে আফগানিস্তানকে উদ্ধার করবার জন্য। তিনি একজন কুশলী যোদ্ধা। সকলেই ভেবেছিল বিদ্রোহ দমন করে তিনি আবার আমানুল্লাকে দেশে

ফিরিয়ে আন্‌বেন। একটি বিষয়ে নাদির খাঁর ভাগ্য খুবই সুপ্রসন্ন দেখা গেল। ইংরেজ এক কোটি টাকা আর দশ হাজার রাইফেল বন্দুক দিয়ে তাঁকে বিদ্রোহ দমন করতে সাহায্য করলে! বিদ্রোহও শীঘ্র দমন করা হ'ল। কিন্তু আমানুল্লাকে ডেকে না এনে তিনিই সিংহাসনে বস্‌লেন, নাম নিলেন নাদির শাহ্‌! ইংরেজ যে তাঁকে সাহায্য করেছিল তার বোধ হয় এই শর্ত্ত ছিল যে, আমানুল্লাকে আর দেশে ফিরিয়ে আনা চলবে না। অবশ্য অনেকে এরূপ সন্দেহ করেন।

আমানুল্লা দেশে যে-সব সংস্কার প্রবর্ত্তন করতে চেয়েছিলেন, নাদির শাহ্‌ও তাই বাহাল রাখ্‌লেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লোকে নাদিরের আইনগুলি এক বাক্যে মেনে নিলে। এর রহস্য এখনও উদ্‌ঘাটিত হয় নি। তবে আমানুল্লার মত সাত-তাড়াতাড়ি তিনি কিছু করেন নি। তিনি মূলে হাত দিলেন। লোকে যাতে এ সব রাজার হুকুম মনে না ক'রে নিজেদের কর্ত্তব্য বলে গ্রহণ করে তিনি তার ব্যবস্থা করলেন—দেশে একটি নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত ক'রে। সরকারী বিভিন্ন বিভাগ মন্ত্রীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। একটি জাতীয় পরিষদ, সেনেট ও জীর্গা গঠন করা হ'ল। সেনেটের সদস্য হলেন পঁয়তাল্লিশ জন, তাঁরা জীবনভর সদস্য থাকবেন। জাতীয় পরিষদের সভ্য হলেন এক শ' চারজন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দেশবাসীর ভোটে এঁরা নির্ব্বাচিত হন।

সাধারণতঃ মে মাস হতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত এর অধিবেশন বসে। রাজসংক্রান্ত কোন গুরুতর বিষয় উপস্থিত না হলে জীর্গা ডাকা হয় না। প্রায় চার বছর অন্তর অন্তর জীর্গা ডাকবার কথা। এত করেও কিন্তু নাদির শাহ্ দেশবাসী সকলের মন পেলেন না। এক দল লোক বিশ্বাস করত যে, নাদীর শাহ্ আমানুল্লার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তাই ১৯৩৪ সালে এক সভায় বক্তৃতা করবার সময় তিনি আততায়ীর হস্তে নিহত হন। এর পরে নাদির শাহের পুত্র মহম্মদ জাহির শাহ্ উনিশ বছর বয়সে আফগানিস্তানের রাজা হলেন। নাদিরের ভ্রাতা তাঁর প্রধান উপদেষ্টা। এঁদের সমবেত চেষ্টায় আফগানিস্তানে আর বিদ্রোহ হতে পারে নি। জাহির শাহের এখন বয়স প্রায় বত্রিশ বছর। যুবকের প্রগতিশীল দৃষ্টি নিয়ে তিনি দেশ শাসন করছেন। পিতার উদার শাসন-নীতি তিনি অনুসরণ করে চলেছেন। রাষ্ট্রের নানা বিভাগে তিনি বিদেশী উপদেষ্টা নিযুক্ত করেছেন। ইটালী, জার্ম্মানী, জাপান এই তিনটি দেশের প্রভাব এখানে বেশী পড়েছে। জাহির সৈন্য বিভাগে জার্ম্মান ও ইটালীয়ান বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেছেন। কাবুলে একটি যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষার স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিমানপোত ব্যবহার করতেও লোকেরা শিখ্ছে।

আমানুল্লার সময় আফগানিস্তানে রুশীয় মালের কাটৃতি বৃদ্ধি পায়, পরে কিছুকাল জাপানী মাল খুব কাটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা

বলেন, জাপানী মালে ওদেশ যেন ছেয়ে গেছে। আবার কৃষি-বিভাগ, সেচ-বিভাগ, শিল্প-বিভাগেও বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সাহায্য খুবই নেওয়া হচ্ছে। আফগানিস্তানে খনিজ দ্রব্য বিস্তর, জাপানীদের সাহায্যে এসব আহরণের চেষ্টা চল্‌ছে। শিক্ষা, শিল্প ও দেশ-রক্ষা এই তিনটি বিষয়ের উন্নতিতে জাহির শাহ্ বিশেষ মনোযোগী। তিনি ১৯৩৭ সালে জাতীয় পরিষদের উদ্বোধন কালে তাঁর নীতি এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন,—

"আমাদের এখনও অনেক কাজ করতে বাকী। একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, আজ অন্যান্য অগ্রসর জাতি যেরূপ শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নতি লাভ করেছে আমরা যেদিন সেরূপ উন্নতি লাভ করব, তাদের মত সম্পৎশালী এবং স্বদেশ-রক্ষার জন্য আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হতে পারব সেদিন আমাদের সত্যিকার উন্নতি হয়েছে বলে গর্ব্ব করা চলবে। এসকল বিষয় বিবেচনা করে গবর্ণমেণ্ট বছরের আরম্ভেই বার্ষিক বজেটে শিক্ষা, ও সৈন্য বিভাগের খাতে বেশী পরিমাণ টাকার বরাদ্দ করেছেন।"

ঐ বছরের বজেটে সৈন্যখাতে বরাদ্দ হয়েছিল ৭,১৬,৪৪,০০০ আফগানি টাকা। আফগানিস্তানের সৈন্যসংখ্যা কত জান? ষাট হাজার। ডাক, তার, বেতার, রেডিও প্রভৃতি নানা বিভাগ খোলা হয়েছে। এখানে কিন্তু রেলপথ নেই। তবে দিকে দিকে মোটর রাস্তা তৈরি হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিও হয়েছে খুব। এদেশে বিস্তর ফল জন্মে।

কাব্‌লি মটর, কাব্‌লি বেদনা—তোমরা তো অনবরত শুন্‌ছ। এ ছাড়া বাদাম, পেস্তা, আঙুর প্রভৃতি নানারকম ফলও সেখান থেকে আমাদের দেশে আমদানী হয়। এসব ব্যবসা ভারতবাসীর হাতে অনেকটা রয়েছে। এ থেকেই আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্কের কথা এসে পড়ে। আফগান ও ব্রিটিশদের ভিতরই এ পর্য্যন্ত সম্পর্ক নির্ণয় চলেছে। ভারতবর্ষের বৈদেশিক নীতি বলে নিজস্ব কোন নীতি নেই। ব্রিটেনের বৈদেশিক নীতিই ভারতের বৈদেশিক নীতি বলে গণ্য হয়ে থাকে। এখন কিন্তু এর পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ভারতবাসীর সঙ্গে আফগানীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকায় প্রতিবেশী হয়েও উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হতে পারে নি। আফগানদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সামান্য। এই অজ্ঞতার জন্য, আর প্রীতি স্থাপন না হবার ফলে ভারতবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্যেও বিশেষ ব্যাঘাত ঘটেছে। অন্যে ওদের তুচ্ছ বা ঘৃণা করলেও ভারতবাসী তা করতে পারবে না। আফগানিস্তানের বৈদেশিক নীতি এখন ঢেলে সাজা হচ্ছে। রুশিয়ার দিকে এর আর দৃষ্টি নেই। তুরস্ক, ইরাক ও ইরাণের সঙ্গে এ বিশেষ সন্ধিতে আবদ্ধ। ইটালী, জার্ম্মানী, জাপানও এর সঙ্গে নানা চুক্তি করে এখানে আড্ডা গাড়তে চেয়েছিল। দ্বিতীয় মহাসমরে আফগানিস্তান বরাবর নিরপেক্ষই ছিল।

—তিন—

ইরাণ

এর সঙ্গেই ইরাণ বা পারস্যের কথা এসে পড়ে। ইরাণও আমাদের নিকট-প্রতিবেশী। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পরই যেমন আফগানিস্তান, বেলুচিস্তানের পরই তেমনি ইরাণ। এর সঙ্গেও ভারতবর্ষের সম্পর্ক বহু দিনের পুরাতন। জাতি হিসাবে ভারতবাসী ও ইরাণীর ভিতর যোগাযোগ রয়েছে। অতীত যুগে মধ্য এশিয়া থেকে আর্য্যদের এক শাখা এসেছিল ভারতে. আর এক শাখা গিয়েছিল এই ইরাণ দেশে। মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হবার আগে এরা ছিল অগ্নি-উপাসক। আমাদের দেশে যে-সব পার্শী রয়েছে তারা প্রাচীন ইরাণীদের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি পুরাপুরি বর্ত্তমান যুগে বজায় রেখেছে। ইরাণীরা ধর্ম্মে মুসলমান হলেও নিজ বৈশিষ্ট্য কিন্তু একেবারে হারায় নি। ইস্‌লাম একটা বিশিষ্ট রূপ পেয়েছে এখানে। মুসলমান ধর্ম্মের সুফী-বাদের জন্ম হয় আরবে, কিন্তু এখানে তা প্রসার লাভ করে। ইরাণীরা সিয়া মুসলমান। মোগল যুগে ভারতবর্ষের সঙ্গে এদের খুবই যোগাযোগ ঘটে। কিন্তু আজ এই ইংরেজ আমলে তারা যেন কতই না দূরে!

ইরাণ বর্ত্তমান যুগের সঙ্গে সমান তালেই চলেছে। এতকাল 'পারস্য' নামেই এদেশ অভিহিত হত। পারস্য—এর একটি ছোট জেলার নাম। রেজা শাহ্ পহ্লভী গত ১৯৩৫ সালে এর নাম বদলে ইরাণ করে দিয়েছেন। ইরাণ বল্‌তে বোঝায়—তুর্কী থেকে আফগানিস্তান পর্য্যন্ত ভূখণ্ড! আগেকার পারস্য সাম্রাজ্য এতটা জুড়েই ছিল। রেজা শাহ্ ছিলেন জাতির অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতির খুবই পক্ষপাতী। মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেছি বলে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও যে হারাতে হবে এমন কোন কথা নেই। তাই তিনি প্রাচীন অনেক কিছুই নূতন করে প্রবর্ত্তন করলেন। পহ্লভীর দেওয়া ঐ নাম সকলেই মেনে নিয়েছে। ইতিহাস, ভূগোলে আজ এই নাম দেখবে। ভাষার নামও আর 'ফার্শি' নেই, 'ইরাণী' হয়েছে। এই একটি ব্যাপার থেকেই, রেজা শাহের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তোমরা বুঝতে পার।

১৯১৯ সাল ইরাণের পক্ষে বড়ই খারাপ বছর। ইউরোপে লড়াই থেমে গেল বটে, কিন্তু এখানে বিদেশীর উৎপাত কমল না। শাহ্‌কে দিয়ে ইংরেজ এ বছরে একটা হীন সন্ধি করিয়ে নিলে। ইংরেজের প্রভাব সমস্ত ইরাণের উপর ছড়িয়ে পড়বার উপক্রম হ'ল। ওদিকে উত্তর সীমানায় রুশ বিপ্লবীরা একটা স্বতন্ত্র রাজ্য গঠন করলে।

রেজা শাহ্ জাতিতে কসাক। উত্তর ইরাণের সেনা দলে তিনি একজন সামান্য সৈনিকের কাজ করতেন। রুশ বিপ্লবীদের বাধা

দিতে গিয়ে তিনি হেরে যান। এর জন্য দায়ী ছিল গবর্ণমেণ্টের তৎকালীন কর্ণধারগণ। তাই রেজা মাত্র তিন হাজার সৈন্য নিয়ে রাজধানী তেহেরানের দিকে ছুটলেন, গবর্ণমেণ্ট হাত করবার জন্য। দেশের দুর্দ্দশা দেখে তিনি এতই মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। সকল উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী সরে দাঁড়ালেন। রেজা নিজের ইচ্ছামত মন্ত্রীসভা গঠন করলেন সুলতানকে দিয়ে। তিনি নিজে হলেন প্রধান সেনাপতি। ১৯২১ সালে এসব ঘটল। ইরাণের জনসাধারণ ছিল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, নিজেদের স্বার্থ জাতির স্বার্থের চেয়ে বড় করে দেখ্‌ত অনেকেই। রেজা দিকে দিকে সৈন্য পাঠিয়ে দুর্দ্দান্ত, স্বার্থপর, জাতিদ্বেষী সবাইকে দমন করলেন। অল্পকাল মধ্যেই তাঁর স্বজাতিপ্রেমের ছোঁয়াচ জনসাধারণের মনে গিয়ে লাগ্‌ল। সকলেই জাতির স্বার্থ রক্ষার জন্য এক হয়ে দাঁড়াল। নিজের শক্তি আঁচ করে, ইংরেজের সঙ্গে পূর্ব্বে যে হীন সন্ধি হয়েছিল তা তিনি এবারে নাকচ করলেন। রুশ বিপ্লবীদেরও তিনি তাড়িয়ে দিতে সমর্থ হলেন।

ইরাণের শাহ্‌ ছিলেন নামকাওয়াস্তে রাজা, বিলাসের পঙ্কেই তিনি ডুবে থাকতেন। তিনি এ সময়ে গেলেন বিদেশে। তাঁর উপরে বালক বৃদ্ধ সকলেই চটা। যিনি স্বদেশকে এক সময় পরের হাতে সঁপে দিতে চেয়েছিলেন তাঁর উপর কে সন্তুষ্ট থাক্‌বে বল? রেজা শাহের তখনকার নাম রেজা খাঁ। তিনি ইতিপূর্ব্বেই শাহের প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন। এঁর বিদেশে গমনের সুযোগ

নিয়ে তিনি গণ-পরিষদ আহ্বান করলেন। এই গণ-পরিষদ কথাটির ইংরেজী নাম 'কন্‌ষ্টিটিউয়েণ্ট এ্যাসেম্বলী'। এ কথাটি তোমরা কংগ্রেসের কোন কোন প্রস্তাবে দেখ্‌তে পাও। এর অর্থ—জাতির সকল বিভাগ ও শ্রেণীর লোকের প্রতিনিধি নিয়ে একটা বিরাট্ সম্মেলন। বিশেষ কোন সঙ্কটের সময়ে, বা বিশেষ কোন ব্যাপারে জাতির মত নিতে হলে এইরূপ গণ-পরিষদ আহ্বান করা হয়। ইরাণে তখন ভীষণ সমস্যা উপস্থিত,—রাজা কে হবেন! আগে সেই ১৯০৬ সালে বিলাতি পার্লামেণ্টের অনুকরণে 'মজলিস' গঠিত হয়েছিল। দেশ শাসন ব্যাপারে শাহের মন্ত্রীসভাকে এর মতামত নিয়ে চল্‌তে হত। রেজা খাঁ এর সাহায্যেই গণ-পরিষদ আহ্বান করলেন। জনমত তখন তাঁকেই চাইছে। তাই গণ-পরিষদ তাঁকে একবাক্যে ইরাণের রাজা বলে মেনে নিলে। রেজা খাঁ নাম নিলেন রেজা শাহ্‌ পহ্লভী। পূর্ব্ব সুলতান বিদেশে থাক্‌তেই খবর পেলেন তিনি সিংহাসন থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। এর পরেই ইরাণের নূতন জীবন সুরু হ'ল।

আগেই তো লোকে রেজা খাঁর নামে ভয়ে কাঁপত। এখন রেজা শাহ্ ইরাণের রাজা—জাতির দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। এখন যে লোকে তাঁকে সমীহ করে চল্‌বে তা আর বল্‌তে? রেজা শাহ্ আগেই উত্তর ইরাণ থেকে রুশিয়াকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজ যে দক্ষিণ ইরাণে একেবারে জেঁকে বসেছে।

কি করে তাদের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করা যায় এর পরে এ-ই হ'ল তাঁর চিন্তা। 'ক্যাপিটুলেশন' কথাটির মানে আগে তোমাদের বলেছি। ইরাণেও বিদেশীদের আয়ত্তাধীন অঞ্চলগুলি তাদের ইচ্ছামতই শাসিত হ'ত। রেজা শাহ্ বললেন, তা হবে না, ইরাণের সর্ব্বত্রই গবর্ণমেণ্টের শাসন চালাতে হবে। রেজা শাহের যে কথা সেই কাজ। বিদেশীদের ওজর-আপত্তি কিছুই টিক্‌ল না। তিনি ক্যাপিটুলেশন তুলে দিলেন।

বিদেশীর প্রভাব মুক্ত হতে হলে ইরাণের রাষ্ট্র-সংঘের সভ্য হওয়া দরকার। তিনি একে অবিলম্বে সংঘের সভ্য-শ্রেণী ভুক্ত করালেন।

বহুদিন ধরে রুশ ও ইংরেজ ইরাণকে নিজ আওতার মধ্যে আনতে চেষ্টা করেছিল। রেজা শাহ্ চতুর রাজনীতিক। একের বিরুদ্ধে অন্যকে খেলিয়ে তিনি নিজ শক্তি দৃঢ় করে নিয়েছেন। রুশের ইচ্ছা—ইরাণের উত্তর সীমা হতে পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত রেলপথ তৈরী হোক, আর ইংরেজ চায়, বাগদাদ থেকে তেহেরাণ পর্য্যন্ত রেল লাইন স্থাপন করতে, তাহ'লে ইরাণ হতে তেল চালান দেওয়া তার পক্ষে সুবিধা হবে। ইরাণের এই তেল আহরণের কাহিনী পরে বলছি। রেজা শাহ্ কাউকেই 'না' বলে অসন্তুষ্ট করলেন না। তিনি উভয়েরই সাহায্য নিয়ে উত্তরে কাস্পিয়ান সাগর তীর থেকে দক্ষিণে পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত রেল লাইন তৈরী করালেন। কিন্তু

এমন অখ্যাত অগম্য জায়গায় এর আরম্ভ ও শেষ হয়েছে যে, এতে উত্তর দিক থেকে রুশেরও কোন্ সুবিধা হ'ল না, আবার দক্ষিণ দিকে ইংরেজও এর দ্বারা উপকৃত হ'ল না। ইংরেজের আওতা থেকে শেষের স্থানটি অনেক দূরে। রেজা শাহ্ একটি বিষয়ে খুবই হুসিয়ার। তিনি কারুর কাছ থেকে টাকা ধার করেন নি। রেল লাইন হাজার মাইল লম্বা, আর এতে টাকা খরচ হয়েছে কম করে হলেও পনর কোটি।

রেল লাইন সুবিস্তৃত হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য দিন দিন হুহু করে বেড়ে গেছে। দেশ ক্রমশঃ সম্পৎশালী হয়েছে। এখানে আর একটি কথা বলে রাখি। ইরাণ আয়তনে বাংলা-বিহার-আসামের তিন গুণ। কিন্তু লোকসংখ্যা এই তিনটি প্রদেশের ছ' ভাগের এক ভাগ, মাত্র দেড় কোটি। তবে এর অর্দ্ধেকটাই মরুভূমি। এখানে শস্য যা' জন্মে তাতে অধিবাসীদের ভরণ-পোষণ বেশ চলে। আগে চলাচলের সুবিধা ছিল না। এজন্য দেশের এক দিকে খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য্য হলেও অন্য দিকে তার অভাব ঘট্‌ত খুবই, ফলে এর কোন-না-কোন অঞ্চলে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ হ'ত। এখন রেলপথ স্থাপিত হওয়ায় দুর্ভিক্ষ একরূপ হয় না বল্‌লেই চলে। ইরাণীদের খাদ্য গমের আটা। এখানে ফল-মূলও হয় বিস্তর, তাও এরা খায়, আবার বিদেশে চাল্লানও দেয়।

ইরাণের খনিজ সম্পদের মধ্যে প্রধান হ'ল তেলের খনি। জগতে যে-সব দেশ তেলের খনিতে সমৃদ্ধ, তাদের ভিতরে

এর স্থান তৃতীয়। বহুদিন পূর্ব্বে ১৯০১ সালে উইলিয়ম নক্স ডার্সি নামক এক ইংরেজ ইরাণের তেলের খনি অঞ্চলগুলি ষাট বছরের জন্য ইজারা নেয়। ইরাণের পাঁচ ভাগের প্রায় চার ভাগের উপরই ছিল এই ইজারা। তখন রাজ-সরকারকে লাভের শতকরা ষোল ভাগ দেবে বলে ঠিক হয়েছিল। রাজস্বের চার ভাগের একভাগ হ'ল এই খাজনার পরিমাণ। কিছু বলা নেই কওয়া নেই, রেজা শাহ্ ১৯৩২ সালে একদিন এই ইজারা বাতিল করে দিলেন। এতদিন লোকে তাঁর শক্তি বুঝতে পারে নি। এবারে বুঝলে তাঁর শক্তি কত! ইংরেজ রাষ্ট্র-সংঘে নালিশ করলে। সংঘ এই মীমাংসা করলেন যে, সরকারে আরও বেশী খাজনা দিতে হবে। ইরাণের অতখানি জুড়েও আর ইজারা চল্‌ল না, আগেকার জায়গার প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণই কমিয়ে দেওয়া হ'ল। রেজা এরূপই চেয়েছিলেন। তিনি ইরাণকে রাষ্ট্র-সংঘের সভ্য কেন করিয়েছিলেন এ ব্যাপারে তাও বেশ বুঝা গেল।

এ থেকে রেজা শাহের পররাষ্ট্র বা বৈদেশিক নীতির কথাও এসে পড়ে। যে রাষ্ট্র পররাষ্ট্র-নীতিতে যত কৌশলী সে রাষ্ট্র তত শীঘ্র উন্নতি লাভ করতে পারে। অল্পকালের ভিতরই ইরাণ যে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হতে পেরেছে তার কারণ পররাষ্ট্র-নীতিতে রেজা শাহের অদ্ভুত দক্ষতা। তিনি স্বদেশকে রুশ ও ইংরেজের কবলমুক্ত করলেন, অথচ এদের সঙ্গে মিত্রতাও

বজায় রেখে চললেন। মুসলমান রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তিনি কম দূরদর্শিতার পরিচয় দেন নি! তুরস্ক, ইরাক, ইরাণ ও আফগানিস্তান যেন এক সূত্রে গাঁথা ক'টি ফুল। ইটালী ও জার্ম্মানীর প্রভাবও ইরাণের উপর তখন থেকে কিছু কিছু পড়ে।

রেজা শাহ্ পহ্লভীকে অনেকে কামাল আতাতুর্কের সঙ্গে তুলনা করেন! বাস্তবিক আতাতুর্কের মতই তিনি দেশের চেহারা বদলে দেন। তুরস্কের সকল কার্য্যে যেমন ধর্ম্মকে বাদ দেওয়া হয়েছে, রেজা শাহ্ কিন্তু তা হতে দেন নি। তবে দেশের উন্নতির জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুই মাত্র তিনি বাহাল রেখেছেন। বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ এ সকল বিষয়ে সংস্কার সাধিত হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও মোটামুটি শরিয়ৎ অনুসারেই এ সব সম্পন্ন হয়। ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন উন্নত দেশগুলির আদর্শেই রচিত হয়েছে। আগে লোকশিক্ষার ভার ছিল ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানগুলির উপর। একে এখন তিনি সম্পূর্ণরূপে এনেছেন রাজ-সরকারের হাতে। নারী-শিক্ষার বন্দোবস্ত তিনি করেছেন, নারীর স্বাধীন চলাফেরায় এখন আর কোন বাধা নেই। এতে গোঁড়াদের ওজর-আপত্তি কিছুই টেকে নি। রাণী বিনা অবগুণ্ঠনে প্রকাশ্য রাজপথে বার হয়ে থাকেন। বিজ্ঞানের নূতন নূতন বিষয়গুলিও ইরাণে প্রবর্ত্তিত হয়েছে। বেতার, বিদ্যুৎ, রেডিও, মোটর-গাড়ী আজ সেখানে নূতন জিনিষ নয়। রেজা শাহ্ মধ্যযুগীয় জমীদারী

প্রথা তুলে দেন! এখন প্রজা-সাধারণ জমির মালিক। রেজা শাহ্ প্রচুর সোণা সঞ্চয় করে রেখেছিলেন। এ সকলই তিনি জাতির উদ্দেশ্যে দান করেন।

দেশ-রক্ষার আয়োজনও তিনি সাধ্যমত করেছিলেন। তখন চারদিকে রণবাদ্য বেজে উঠে। দেশ-রক্ষার জন্যে সকলেই তখন ব্যাকুল। তিনিও সাধ্যমত সৈন্য সংগ্রহ করে রেখেছিলেন! ইরাণে প্রত্যেককেই জীবনের কিছু সময় যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষায় কাটাতে হয়। এর নৌ-বাহিনী ও বিমানপোতও কিছু আছে।

গত ১৯৪১ সালে ইরাণের আবার কতকটা ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটেছে। ঐ সময় জার্ম্মানবাহিনী যখন গ্রীক পর্য্যন্ত অগ্রসর হয় তখন জানা যায় যে ইরাণেও প্রচুর জার্ম্মান এসে রয়েছে। এর পরে রুশিয়ার সঙ্গে জার্ম্মানীর সংঘর্ষ বাধে। তখন ব্রিটেন ও রুশিয়া রেজা শাহের উপর এই বলে চাপ দেয় যে, জার্ম্মানদের ইরাণ থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। ইরাণ নিরপেক্ষ রাষ্ট্র, কাজেই রেজা এ কথা শুনতে চাইলেন না। তখন দু'দিক থেকে রুশ ও ব্রিটিশ সেনা ইরাণের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ইরাণকে আসন্ন বিপদ থেকে মুক্ত করবার জন্য রেজা শাহ্ তখন নিজেই সিংহাসন ত্যাগ করে বিদেশে চলে গেলেন। তিনি কিছুকাল মেক্সিকোতে বাস করেছিলেন। পরে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে যান। সেখানেই তিনি দেহত্যাগ করেছেন। এদিকে তাঁর পুত্র ইরাণের শাহ্ হয়েছেন।

জার্ম্মানবাহিনী ইরাণের ভিতর দিয়ে পূর্ব্ব দিকে ভারতবর্ষে অভিযান চালাতে পারে এই আশঙ্কায় মিত্রপক্ষ ইরাণকে আওতার মধ্যেই এনে ফেলে ও এখানকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে তারা ঘাঁটি স্থাপন করে।

বাইরের ব্যাপারে ইরাণের স্বাধীন অস্তিত্ব বর্ত্তমানে নেই বললেই চলে। রুশ, মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনী সেখানে বহুদিন আড্ডা গেড়েছিল। ইউরোপীয় যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন বাহিনী ইরাণ থেকে চলে গেছে, কিন্তু রুশ ও ব্রিটিশ বাহিনী এখনও সেখানে রয়েছে। দক্ষিণ ইরাণে ব্রিটিশেরই প্রাধান্য। ইরাণের তৈল সম্পদ প্রচুর, তোমাদের আগেই বলেছি। এই তৈলের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে ব্রিটেন ও রুশিয়ার মধ্যে দরকষাকষি চল্‌ছে এখনও। এই যুদ্ধের মধ্যে ব্রিটিশ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে বহু ভারতবাসীও সেখানে গিয়েছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যও ইরাণের সঙ্গে ভারতবাসীদের কিঞ্চিৎ বেড়ে গেছে। সম্প্রতি ডাঃ মেঘনাদ শাহা মস্কোর পথে ইরাণের রাজধানী তেহেরাণে কয়েকদিন অবস্থান করেন। এর কথা প্রসঙ্গে ইরাণের সঙ্গে ভারতের সংস্কৃতির যোগাযোগের বিষয় তিনি বলেছেন। উভয় দেশের প্রাচীন সভ্যতার মূল এক। পরস্পরের ইতিহাস পরস্পরের জানা থাকলে ভারতবাসী ও ইরাণীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থায়ী হতে পারে। ইরাণের পূর্ব্ব স্বাধীনতা আবার কবে ফিরে আসবে কে জানে?

ইরাণ থেকে আমরা বেদুইনের দেশ আরবে এসে পড়েছি। সাধারণের কাছে আরব এখনও একটি রহস্যপূর্ণ দেশ। তোমরা 'আরব্য উপন্যাসে' এর নাম নিশ্চয়ই শুনেছ, কেউ কেউ পড়েছও হয়ত। বহু চমকপ্রদ কাহিনী যেন একে রহস্যের আবরণে ঢেকে রেখেছে। আরবদের বাস্তবরূপও কম চমকপ্রদ নয়। তারাও আজ যুগধর্ম্মের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চল্‌তে সুরু করেছে।

ইরাণ দেশের কাছে ইরাক। এই ইরাক থেকে মিশর পর্য্যন্ত আরবদের বসতি। প্রাচীনকালে শিক্ষা ও সভ্যতায় উন্নত ছিল আরবরা, দুর্দ্ধর্ষও ছিল খুব। তারা এমন শক্তিশালী যে রোম-সাম্রাজ্যের নিকট কখনই একেবারে মস্তক বিলিয়ে দেয় নি। আরবের উত্তর দিকে ভূমধ্যসাগর তীরে কতকটা ফালির মত জায়গা অধিকার করেই রোমের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। পরে মহম্মদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আরবরা নূতন প্রেরণা লাভ করে, তারা দিকে দিকে ইসলামের বার্ত্তা প্রচারও

সুরু করে দেয়। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র পশ্চিম, দক্ষিণ ও মধ্যএশিয়া, উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ ইউরোপ ও সুদূর স্পেন পর্য্যন্ত ইসলাম ধর্ম্ম ছড়িয়ে পড়ে। তুর্কীরা এশিয়া মাইনরে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। তারাও ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করলে এবং নবোদ্যমে রাজ্য বিস্তারে মন দিলে ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীদের কনষ্ট্যাণ্টিনোপল অধিকার ইতিহাসের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। আরবভূমিও ক্রমে শক্তিমান তুর্কী-সাম্রাজ্যের অধীন হয়ে যায়।

আরবরা কিন্তু স্বাধীনতাকে ধর্ম্মের মতই প্রাণ দিয়ে ভাল-বাসে। তুর্কীসাম্রাজ্যের অধীন হলেও তারা তাদের স্বাধীন চিত্তবৃত্তি কখনো হারায় নি। আরবের দূরদূরান্তে তুর্কী শাসন কখনো পৌঁছয় নি। এর ভিতরে জগতে শিল্প, বাণিজ্য,রাজ্য-শাসন প্রভৃতি বিষয়ে যুগান্তর এসে গেল। আরবরা তখন গৃহ-হারা যাযাবর বেদুইন বলে ঘৃণিত হলেও এ সবের ঢেউ তাদের ভিতরেও এসে পৌঁছল। তুর্কী কিন্তু রইল পিছনে পড়ে। পুরাতনকে আঁকড়ে থাক্‌তে গিয়ে আগেকার শক্তিও সে হারালে। বিগত ১৯০৮ সালে তুরস্কে শাসন-ব্যবস্থার খানিকটা পরিবর্ত্তন হয়। আরবরাও দাবি করলে—দেশ-শাসনে তাদেরও অধিকার দিতে হবে। তারা খানিকটা পেলও, কিন্তু তাতে তারা মোটেই খুশী হতে পারে নি। এ সময়ে তুর্কীর পরিবর্ত্তে আরবী ভাষাই আরবে রাষ্ট্রভাষা বলে গণ্য হয়। আরবদের তুর্কী বিদ্বেষের

সুযোগ নিয়ে অনেক আগে থেকে ইংরেজ ও ফরাসীরা আরবে আড্ডা গাড়তে আরম্ভ করে। ১৯০৮ সালের পর হতে তাদের প্রচারকার্য৷ আরও জোরে চল্‌তে থাকে।

এর পর মহাসমর বাধল। তুরস্ক যোগ দিলে জার্ম্মানীর সঙ্গে। এদিকে জার্ম্মান-বিরোধী ইংরেজ ও ফরাসীরা কেমন করে আরবদের হাত করে ফেলেছে তুর্কীরা তা বুঝতেই পারলে না। ১৯১৮ সালে তুর্কী সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়ে আরব থেকে চিরতরে বিদায় নিতে বাধ্য হয়। আরবরা কিন্তু মিত্র-শক্তিদের সাহায্য করতে রাজি হয়েছিল মাত্র একটি শর্ত্তে—তুরস্কের অধীনতা-পাশ মুক্ত করে তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। এই প্রসঙ্গে কর্ণেল টি ই লরেঞ্চ নামক একজন ইংরেজের কথা তোমাদের বলে রাখ্‌ছি। যাঁরা আরবদের তুর্কীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে উত্তেজিত করেছিলেন তাঁদের ভিতর এঁর কৃতিত্ব সব চেয়ে বেশী। তিনিও আরবদের ঐ শর্ত্তটি মেনে নিয়েছিলেন। যুদ্ধের পর কিন্তু আরবদের উপর বিশ্বাসঘাতকতা করা হ'ল। আরবের উত্তর অংশকে ইরাক (আগেকার নাম মেসোপটেমিয়া), সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন এই তিনটি ইংরেজ ও ফরাসীর ম্যাণ্ডেট বা শাসনাধীন রাজ্যে পরিণত করা হয়। মক্কার আমীর হুসেনকে দক্ষিণ আরবের আর তাঁর এক পুত্রকে প্যালেষ্টাইন সংলগ্ন ট্রান্সজর্ডানের রাজা করা হ'ল। আবার, প্যালেষ্টাইনকে একটা ইহুদী-আবাসে পরিণত করাও ঠিক হ'ল।

সমগ্র আরবে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠ্‌ল। লরেন্স দেখ্‌লেন তাঁর প্রতিশ্রুতি কিছুই পালন হচ্ছে না। তিনি ক্রোধে ও ক্ষোভে চাক্‌রি ছেড়ে দিয়ে, পদক পুরস্কার সব ফেরত পাঠিয়ে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। তিনি নিজেও কিন্তু একজন ইংরেজ !

আরবদের খুশী করবার জন্য এর পরে কিছু কিছু চেষ্টা হয়। ইংরেজ ইরাকের উপর থেকে খবরদারি তুলে নিলে। আমীর হুসেনের এক পুত্র আমীর ফয়জলের অধীনে একে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়। ফয়জলের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্রের হস্তে দেশের শাসনভার ন্যাস্ত হয়েছে। ইরাণের মত ইরাকেও একদল লোক জার্ম্মানীর সহযোগিতার আশায় ইংরেজের বিরুদ্ধে গত ১৯৪১ সালে অস্ত্রধারণ করে। কিন্তু তাদের বিদ্রোহ বেশী দূর না গড়াতেই থামিয়ে দেওয়া হয়। বিদ্রোহীদলের কয়েকজনের ফাঁসি হয়। নেতা আবদুর রসিদ জার্ম্মানীতে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করেন। ইরাকের শাসন-ব্যবস্থা মহাসমরের সময় ব্রিটিশের অঙ্গুলি হেলনেই পরিচালিত হয়েছিল।

আমীর হুসেন পয়গম্বরের বংশধর বলে পরিচিত হলেও তাঁর উপর আরবদের বিশেষ আস্থা ছিল না। তিনি ছিলেন বিলাসী ও অসদাচারী। দক্ষিণ-মধ্য আরবে ওয়াহাবি নামে এক গোঁড়া আরব সম্প্রদায় ছিল, এখনও আছে। তারা কোরাণের

প্রতিটি আদেশ মান্য করে চলে, এজন্য সাধারণ লোকের নিকট তারা খুবই সম্মান পেয়ে থাকে। এই দলের নেতা ইবন সৌদ আমীর হুসেনকে দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। তিনি বিস্তর সৈন্যসামন্ত সঙ্গে নিয়ে মক্কায় হাজির হলেন। আমীর হুসেন বিনা আপত্তিতেই সরে দাঁড়ালেন। ইবন্ সৌদ আরবের রাজা হলেন। ইংরেজ এতে উচ্চবাচ্য করে নি। বরং তলে তলে ইবন সৌদকে সাহায্যই করেছিল।

এডেনের উত্তর-পশ্চিমে ইমেন নামে আর একটি আরব রাজ্য আছে। এটিও খানিকটা স্বাধীন।

উত্তরে সিরিয়ায় প্রথম কয়েক বছর দাঙ্গাহাঙ্গামা খুবই চলেছিল। ফ্রান্স তাকে খানিকটা স্বাধীনতা দেবে বলে অঙ্গীকার করে। এই দ্বিতীয় মহাসমরে ফ্রান্স জার্ম্মানী কর্ত্তৃক পরাজিত হলে, সিরিয়া দ্য গলে পরিচালিত 'স্বাধীন ফ্রান্সে'র অধীনে আসে। কিছুকাল পরে সিরিয়ার লেবানন প্রদেশ নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করে। কিন্তু 'স্বাধীন ফ্রান্সে'র কর্ত্তারা এতে রাজী না হয়ে, এ প্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডলীকে গ্রেপ্তার করেন। এ ব্যাপারে সর্ব্বত্র চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। মিত্রশক্তিবর্গের চাপেই হয়ত উক্ত কর্ত্তারা শেষ পর্য্যন্ত ধৃত নেতাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হন। তাঁরা নিজ প্রয়োজনে সিরিয়াকে কিছুকাল খুশী ক'রে চলেছিলেন, যুদ্ধ শেষে এখানে আবার দাঙ্গাহাঙ্গামা অশান্তি দেখা দিয়েছে।

জগৎ কোন্ পথে

প্যালেষ্টাইনের হাঙ্গামা বহু দিন চলে। এর মীমাংসার জন্য এখনও পর্য্যন্ত তেমন কোন ব্যবস্থা হয় নি। লণ্ডনে আরব, ইহুদী ও ব্রিটিশদের ভিতর এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। প্যালেষ্টাইনের গ্রাণ্ড-মুফ্তি ব্রিটিশের শত্রু জার্ম্মান দলে ভিড়ে জার্ম্মানীতে চলে যান। জার্ম্মানীর পতনের পর তার অবস্থা কিরূপ দাঁড়িয়েছে এখনও জানা যায় নি।

বলতে গেলে ইবন সৌদই আরবের পুরোপুরি স্বাধীন রাজা। তাঁর দ্বারাই আরবে নব যুগের সূচনা হয়েছে। তিনি ওয়াহাবি দলের নেতা ছিলেন বটে, কিন্তু এখন তিনি গোঁড়ামি অনেকটা বর্জ্জন করেছেন। মরুময় আরবভূমিতে রেলপথ ও মোটর রাস্তা নির্ম্মিত হয়েছে। যাযাবর উপজাতিগুলি তাঁর শাসনাধীনে সমাজবদ্ধ ভাবে বসবাস করতে সুরু করেছে। ছেলেমেয়েদের আধুনিক রীতিতে শিক্ষাদান ব্যবস্থাও প্রবর্ত্তিত হয়েছে। গীতবাদ্য গোঁড়া মুসলমানদের নিকট পাপের বস্তু। ইবন সৌদ কিন্তু এর জন্য বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছেন। বর্ত্তমান যুগের উপযোগী সকল রকম সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করতেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নি। মোটর, মোটর লরী, বাস, রেল, রেডিও প্রভৃতির সঙ্গে বেদুইনরা খুবই পরিচিত। ডাক বিভাগ, তার ও বেতার বিভাগ খোলা হয়েছে। আমোদ-প্রমোদেরও আয়োজন আছে প্রচুর।

বেদুইনের দেশে

হঠাৎ এত সুখ-সুবিধা ভোগের সুযোগ ঘটলেও আসল কথাটি কিন্তু তারা ভোলে নি। তারা স্বাধীন। স্বাধীনতা বজায় রাখতে হলে শক্তি বাড়ান যে আবশ্যক একথা তারা বেশ জানে। এজন্য ইবন সৌদ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে আরবদের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেছেন। আরবরা সেকালের ছোরা তলোয়ার ছেড়ে কামান বন্দুক চালনা করতে আরম্ভ করেছে। বিমানপোতের ব্যবহারও তারা শিখ্‌ছে।

এতদিন আরবভূমি বিশেষ করে ইংরেজেরই আওতায় ছিল। ইবন সৌদ দেখ্‌লেন কোন একটি বিশেষ রাষ্ট্রের আওতায় থাক্‌লে তার ষোল আনা পরিপুষ্টি লাভের সম্ভাবনা নেই। তাই তিনি ইংরেজের নিকট থেকে যতখানি সুবিধা আদায় করা যায় তা করে নিয়ে অন্যের সঙ্গেও নানারূপ সন্ধিতে আবদ্ধ হয়েছেন। আবিসিনিয়া বিজয়ের পর ভূমধ্য-সাগরে ও লোহিত সাগরে ইটালীর ক্ষমতা বেড়ে যায়। এজন্য ইবন সৌদ ইটালীর সঙ্গেও কিছু বোঝাপড়া করে নিয়েছিলেন। ইমেনেরও বন্ধু ছিল ইটালী। প্যালেষ্টাইন থেকে সুরু করে সমগ্র আরবভূমিতে ইটালী ও জার্ম্মানী ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচারকার্য্য অনেক দিন যাবৎ চালিয়েছিল, আরব-দের ব্রিটিশ-বিদ্বেষের সুযোগ নিয়ে। আরবরা কিন্তু খুবই চতুর। নানা জনের ঘাড়ে চেপে নিজ কার্য্য হাসিল করতে তাদের বোধ হয় জুড়ি নেই। তারা তা করেও নিচ্ছে। আবার

তাদের ভিতর জোটও খুব। প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে সমগ্র আরব-ভূমিরই এক মত। একে একটি আরব রাষ্ট্র বলে স্বীকার না করিয়ে তারা হয়ত ছাড়বে না। দ্বিতীয় মহাসমরে সমগ্র আরব ভূমিও আবার মিত্রপক্ষের আওতার মধ্যে আস্‌তে বাধ্য হয়।

আরব প্রসঙ্গে মিশরের কথাও এসে পড়ে। মিশরের সভ্যতা বহু প্রাচীন। তার প্রাচীন ম্যমির ছবি তোমাদের নিশ্চয়ই বিস্ময় জাগাবে। এ-ও তুর্কী সাম্রাজ্যের অধীন হয়েছিল; নামে হলেও গত মহাসমরের আরম্ভ অবধি এর অধীন ছিল বলা যায়। গত শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ইংরেজই কিন্তু এর বুকের উপর কর্ত্তৃত্ব করেছে। সুয়েজ খাল কাটানোই হয়েছিল মিশরের পক্ষে কাল। মিশর এর জন্য খুব ঋণগ্রস্ত হয়। ইংরেজ টাকা ধার দিয়ে মিশরকে ঋণমুক্ত করলে, অংশগুলিও নিজেই কিনে নিলে। মিশরের উপর তার কর্ত্তৃত্ব এই সময় থেকে সুরু হয়। গত ১৯১৪ সালে মহাযুদ্ধ যখন বাধল তখন ইংরেজ মুখোস খুলে ফেল্‌লে। মিশর ব্রিটিশ রাজ্য বলে ঘোষিত হ'ল।

যুদ্ধ শেষে মিশরের দশা আরবের মতই শোচনীয় হয়েছিল। স্বাধীনতা দূরে থাকুক, কোন ক্ষমতাই মিশরবাসী পেলে না। তখন মিশরে জোর আন্দোলন চলে। জগলুল পাশা ছিলেন এ আন্দোলনের প্রধান হোতা। তিনি বহুবার দেশ থেকে নির্ব্বাসিত হন, বহুবার কারাবরণও করেন। কিন্তু মিশরের

স্বাধীনতা আন্দোলন কখনও থামে নি। ইদানীং কিন্তু এর বরাত ফিরে গেছে। ইটালী আবিসিনিয়া জয় করায় তার প্রভাব ভূমধ্যসাগরে ও উত্তর-পূর্ব্ব আফ্রিকায় খুবই বেড়ে গিয়েছিল। কাজেই ইংরেজের পক্ষে মিশরকে বিদ্বিষ্ট করে রাখা সম্ভব হয় নি। গত ১৯৩৬ সালে ব্রিটেন ও মিশরের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। তাতে মিশরের স্বাধীনতা মোটামুটি মেনে নেওয়া হয়েছে। দেশ-রক্ষা ব্যাপারেও তার কর্ত্তৃত্ব এখন স্বীকৃত। তবে আলেকজাণ্ড্রিয়া, সুয়েজ খাল প্রভৃতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ইংরেজের ঘাঁটি থাক্‌বে। দ্বিতীয় মহাসমরে মিশর নিজেকে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেছে। তবে মধ্যে এও একবার একটি যুদ্ধকেন্দ্রে পরিণত হবার উপক্রম হয়। অক্ষ-শক্তি উত্তর আফ্রিকাতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। এই যুদ্ধের মধ্যেই ১৯৪১ সালে মিত্রশক্তিলিবিয়া থেকে অক্ষ-শক্তিকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। পরে আবার সেনাপতি রোমেলের নেতৃত্বে অক্ষ-শক্তি বাহিনী লিবিয়া পুনরধিকার করে প্রবল বিক্রমে মিশরের অভ্যন্তরে অনেকখানি প্রবেশ করে। মিত্র-সেনা পূর্ব্ব ও পশ্চিম থেকে শত্রুপক্ষকে খুবই বাধা দিতে আরম্ভ [illegible]য় শত্রুবাহিনী শেষ পর্য্যন্ত আফ্রিকা থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়। মিশর তখন অনেকটা নিরাপদ হয়। নিরপেক্ষ বলে ঘোষণা করলেও মিশরকে মিত্রপক্ষ স্বার্থ-রক্ষার

জন্য নিজ আওতার মধ্যেই এনে ফেলে। এখানে জগলুল-শিষ্য নাহাস পাশা প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। মিশরের রাজা ফারুক তাঁকে কর্ম্মচ্যুত করে অন্যকে এই পদে নিযুক্ত করেন। এইরূপ বহু ব্যাপারেই প্রমাণিত হয়েছিল যে, মিশরে মিত্র পক্ষই সব কলকাঠি নাড়াচ্ছেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯৪৫) মিশর প্রকাশ্যভাবে মিত্রপক্ষে যোগ দেয়। এর পরই প্রধান মন্ত্রী আহ্‌মদ মেহের পাশা আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

সুয়েজ খালের কথা তোমাদের বলেছি। এ অঞ্চলটি মিশরের অধীন। কিন্তু যে কোম্পানী এই খাল কাটায় তাকে এ অঞ্চল এক শ' বছরের জন্য ইজারা দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৯৬৯ সালে ইজারার মেয়াদ শেষ হ'বে। দ্য লেসেপ্‌স্ নামে একজন ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার এই খাল কাটার ব্যবস্থা করেন। খালটি একশ' তিন মাইল লম্বা। এ খাল কাটতে ঢের অর্থব্যয় হয়েছিল। আগে ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে আস্‌তে হলে আফ্রিকা মহাদেশের উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে আস্‌তে হ'ত। সুয়েজ খাল কাটবার পর পথ অনেকটা সোজা হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজনীতির দিক দিয়ে এর গুরুত্ব খুবই বেড়ে গেছে। দ্বিতীয় মহা-সমরের মধ্যে এক সময় সুয়েজ অক্ষ-শক্তির বিশেষ লক্ষীভূত হয়ে উঠে। বর্ত্তমানে আবার সুয়েজ খালের উপর কর্ত্তৃত্ব নিয়ে মিত্রপক্ষের মধ্যে কথা উঠেছে। প্রকাশ, তুরস্কের দার্দ্দেনেলিস প্রণালীর মত সুয়েজ খালেও রুশিয়া তার কতকটা কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করতে চায়।

আরব প্রসঙ্গে তুরস্কেরও উল্লেখ করা হয়েছে। যার একদিন অতটা বিশাল সাম্রাজ্য ছিল তার এখন কি অবস্থা? তোমরা হূন, তাতার প্রভৃতি নাম শুনেছ। তুর্কীরাও এ রকম একটি জাত। মধ্য এশিয়ার তুর্কীস্তান তাদের আদি বাসস্থান। সেখান থেকে তারা এশিয়া মাইনরে এসে বসবাস আরম্ভ করে। এখানে থাক্‌তে থাক্‌তেই তুর্কীরা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। তারা নবীন উদ্যমে রাজ্য বিস্তার করতে থাকে। রোমের পূর্ব্ব-সাম্রাজ্যের রাজধানী কনষ্ট্যান্টিনোপল তুর্কীরা ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে দখল করে। বলকান উপদ্বীপ, আরব, মিশর এমন কি উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকারও খানিকটা তার অধিকারে আসে। কিন্তু তারা ছিল প্রাচীনপন্থী। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানে দ্রুত অগ্রসর হয় তখন তারা পুরাতনকেই আকৃড়ে থাক্‌তে চেয়েছিল। ইউরোপবাসীরা তুর্কীকে তাই ইউরোপের 'রুগ্ন মনুষ্য' নাম দেয়।

জগৎ কোন্ পথে

গত পঞ্চাশ বছরের ভিতর তুর্কীর নানা ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে। বলকান উপদ্বীপের সবটাই সে একে একে হারায়। মিশর নামে মাত্র তার অধীন থাকে। আরব অধীন থেকেও নানা ভাবে তাকে নাজেহাল করতে লাগল। গত মহাযুদ্ধের শেষে সাম্রাজ্য ত সে হারালই, উপরন্তু নিজ অস্তিত্বও লোপ পাবার উপক্রম হ'ল। ইংরেজ, ফরাসী, ইটালিয়ান, গ্রীক সকলে মিলে তাকে ভাগবাটোয়ারা করে নিতে চাইলে। কামাল-পাশার (পরে, কামাল আতাতুর্ক) নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। তিনি তুরস্ককে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালেন। সাম্রাজ্য তিনি চান নি। ইউরোপ ও এশিয়ার যে অংশটুকুতে তুর্কীদের বাস শুধু সেইটুকুতেই একটি স্বাধীন রিপাব্লিক স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। এতে তিনি বাধা পেয়েছিলেন ঢের। তাঁকে অনেক যুদ্ধবিগ্রহও করতে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সকলকেই নব্য তুর্কীকে মেনে নিতে হয়। ১৯২৩ সালের লজান সন্ধিতে তুরস্কের স্বাধীনতা স্বীকৃত হ'ল।

এর পরই আরম্ভ হ'ল তুরস্কের নূতন যুগ। সুলতানকে আগেই তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি ছিলেন—খলিফা, ঈশ্বরের প্রতিনিধি। মুসলমান জগতে তিনি খলিফা বলে সম্মান পেতেন। কামাল এ পদটি তুলে দিয়ে সুলতান ও তাঁর বংশীয়দের ক্ষমতার শেষ সূত্রটুকুও উচ্ছেদ করলেন। তুরস্ক একটি গণতন্ত্রে পরিণত হ'ল। কামাল হলেন প্রেসিডেণ্ট।

নব্য তুর্কী

তুরস্কের পার্লামেন্টের নাম নেশন্যাল এসেম্বলী। এর ভিতর থেকে সদস্যদের নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠিত হ'ল। কিন্তু ইংলণ্ড ফ্রান্স বা যুক্তরাষ্ট্রের মত এখানে একাধিক দল নেই, একটি দলই বরাবর দেশ শাসন করেছে। মাঝে কামাল একবার একটি বিরুদ্ধ দল গড়বার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন দেখলেন দেশের উন্নতির পক্ষে তারা বিঘ্ন ঘটাচ্ছে তখন এ দল তুলে দিলেন। ১৯৩৮ সালের নবেম্বর মাসে কামাল মারা যান। তাঁর স্থলে যিনি প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন তাঁর নাম ঈশমেত ইনোনু। তিনি কামালের যোগ্য সহচর। গত ১৯২৩ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি তুরস্কের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। মিত্রশক্তির ছলচাতুরী ভেদ করে তুরস্ককে মুক্ত করতে তাঁর চেষ্টা কামালের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। তিনি কর্ণধার হওয়ায় তুরস্ক ক্রমশঃ উন্নতির দিকেই চলেছে।

যে-সব কারণে তুর্কীজাতি সভ্য-জগতের সঙ্গে তাল রেখে চলতে বাধা পায়, কামাল রাষ্ট্রের ভার নিয়ে একে একে তা সমূলে উৎপাটিত করে দিয়েছেন। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই তুর্কীজাতির প্রাণে একটা নূতন চেতনার সঞ্চার করলেন। তাঁর সংস্কারকার্য্য মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়—ধর্ম্ম, সমাজ ও অর্থনীতি। ধর্ম্মগত কুসংস্কার দেহ মনে মানুষকে যতটা পঙ্গু করে রাখে এমনটি আর কিছুতেই করতে পারে না। তিনি প্রথমেই খিলাফৎ উচ্ছেদ করলেন! কিছুদিন মুসলমান

ধর্ম্ম রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম হিসাবে রেখেছিলেন, শেষে তাও তুলে দিলেন। মোল্লা মৌলবীদের প্রভাব থেকে শিক্ষা সংস্কৃতিকে মুক্তি দিলেন। মস্‌জিদ বা ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানগুলির সমস্ত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করলেন। তুর্কীদের ভিতরও সনাতনপন্থী গোঁড়া লোক ঢের ছিল। তারা আপত্তিও করেছিল। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি কামালের হস্তে। তিনি অবিলম্বে সব বিরোধিতা থামিয়ে দিলেন।

সামাজিক ব্যাপারে কামাল যে-সব পরিবর্ত্তন ঘটালেন তা শুনলে তোমরা আশ্চর্য্য হবে। পোষাক-পরিচ্ছদ থেকে আরম্ভ করে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় সবকিছু জিনিসের উপরই তিনি নজর দিলেন। তুর্কী পুরুষরা স্মরণাতীত কাল থেকে ফেজ পরে আস্‌ছে, আর নারীরা পরেছে বোর্‌খা। তিনি দুই-ই তুলে দিলেন আইন করে। এর ব্যতিক্রম হলে আইনতঃ দণ্ডনীয় হতে হয়! এ ব্যাপারে কোথাও কোথাও বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হবার আগেই কামাল সব দমন করলেন। তিনি নারীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। নারী ভোট দেবার ক্ষমতা পেয়েছে। রাষ্ট্রের উচ্চ-নীচ সকল রকম কাজে সে পুরুষের সহযোগিতা করছে। স্কুল-কলেজের দ্বার তার নিকট আজ মুক্ত। কামাল দেশের আইন-কানুনও বর্ত্তমান যুগের উপযোগী করে তৈরী করেন। এখন আর কাজির বিচার সেখানে চলে না।

শিক্ষা সম্পর্কেও নূতন ধারা অনুসৃত হয়েছে সেখানে। কামালের ধারণা, আরব সংস্কৃতি ও সাহিত্যের আওতায় থেকে

তুর্কীদের অতটা অধঃপতন হয়েছিল। তিনি আরবির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবার জন্য আরবি হরফ বদলে রোমান হরফ প্রবর্ত্তন করলেন। এখন তুরস্কে শিক্ষা সম্পর্কীয় সকল কিছুই রোমান হরফে হয়। আগে প্রত্যেকের নামের শেষে, 'বে' 'পাশা' প্রভৃতি যোগ করে দেওয়া হ'ত। কামাল এ-ও তুলে দেন। প্রত্যেকের নামের সঙ্গে কোন কৌলিক বা পারিবারিক উপাধি যোগ করে দেওয়া স্থির হয়। কামাল পাশা হয়েছিলেন কামাল আতাতুর্ক (তুর্কীর জনক), বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট ঈশ্‌মেত পাশা হয়েছেন ঈশ্‌মেত ইনোন্থু।

ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা সকল বিষয়েই পরিবর্ত্তন ঘটান হয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে। কিন্তু সকল উন্নতির মূলেই যে রয়েছে অর্থ। অর্থ কোথায় পাওয়া যাবে? বিদেশ থেকে অর্থ ঋণ করে অনেকে স্বাধীনতা হারিয়েছে! একারণ বিদেশীর টাকা গ্রহণে ইরাণ ও শ্যাম বরাবর ইতস্ততঃ করেছে। কামাল ছিলেন একজন কূট রাজনীতিক। বিদেশীরা অর্থ দাদন দিয়ে আগে যে-সব সুবিধা আদায় করে নিয়েছিলেন (যেমন, ক্যাপি-টুলেশন প্রথা) সে-সব তো তিনি তুলে দিলেনই, নূতন করে এমন সব শর্ত্তে তিনি টাকা ধার করলেন যাতে বিদেশীরা তাঁর কোন কাজে টুঁ শব্দ করতে না পারে। তাদের প্রভাবমুক্ত হয়েই তিনি টাকা ধার করেছিলেন বরাবর। তোমাদের এর একটি উদাহরণ দিচ্ছি। গত ১৯৩৪ সালে দেশের শিল্পোন্নতির জন্য

এক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সুরু হয়। রুশিয়ায়ও এর আগে এরূপ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হয়েছে। তাই কামাল রুশ-বিশেষজ্ঞদের নিযুক্ত করে কাজ আরম্ভ করে দলেন—টাকাও এল রুশিয়া থেকে। কিন্তু গত ১৯৩৬ সালে স্পেন-বিপ্লবের সময় ঈজিয়ান সাগরে ইটালীর সাবমেরিন যখন রুশ জাহাজ ডুবিয়ে দেয় তখন রুশিয়া তুরস্কের নিকট সাহায্য চায়। কামাল দেশের স্বার্থের কথা ভেবে এতে রাজি হতে পারেন নি। আজ ব্রিটিশ, জার্ম্মান, মার্কিন, রুশ—নানা জাতের টাকাই তুরস্কের শিল্প কারখানায় খাট্‌ছে। তুরস্কের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হয়েছে আজ চার পাঁচ বছর। এর ফলে কৃষিকর্ম্মে যন্ত্রপাতার ব্যবহার সর্ব্বত্র সুরু হয়। বস্ত্র, ইস্পাত, কাগজ, কাচ, চিনি, ঔষধ, যন্ত্র প্রভৃতি শিল্পে তুর্কী এখন খুব উন্নত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে—প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড়ের শতকরা আশীভাগ সেখানে উৎপন্ন হয়, আর যন্ত্র-পাতির প্রয়োজন সবটাই সে এখন মেটাতে পারে। কিছুকাল পূর্ব্বে দেখা যায় যে, তুরস্কে জার্ম্মানীর ব্যবসা খুবই বেড়ে গেছে। তার বৈদেশিক বাণিজ্যের শতকরা চল্লিশ ভাগই তখন জার্ম্মানীর হাতে ছিল, আর এতে ব্রিটেনের স্থান ছিল তৃতীয়।

ক্রমে শুধু ইউরোপে কেন, সমগ্র জগতেই ঘোর অশান্তি উপস্থিত হয়। তুরস্ককে কোন ইউরোপীয় শক্তিই কখনো পছন্দ করে নি। কিন্তু এরা প্রত্যেকেই তাকে হাত করে নিজ

নিজ উদ্দেশ্য হাসিল করতে চেয়েছে অবিরত। ইংরেজ, ফরাসী, ইটালীয়ান, জার্ম্মান, রুশ প্রত্যেক বড় বড় শক্তিরই স্বার্থ রয়েছে এখানে। বলকান রাষ্ট্রগুলির কাঁচা মাল আহরণ, দার্দ্দেনেলিস প্রণালী দিয়ে স্বাধীনভাবে গমনাগমন, ইরাকের তেলের খনির উপর আধিপত্য বিস্তার, সুয়েজ খালে কর্ত্তৃত্ব স্থাপন প্রভৃতি নানা ব্যাপারেই তুরস্কের সঙ্গে খাতির রেখে তাদের চল্‌তে হ'ত ; কোন কোন ব্যাপারে এখনও তাকে তোয়াজ করতে হয়। তুরস্ক ছোট বড়, শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে বহু রাষ্ট্রের সঙ্গেই সন্ধি স্থাপন করেছে। এ বিষয়ে এর জুড়ি আর একটি রাষ্ট্রেরও নাম করা যায় না। কামালের নীতিই ছিল এই। ইরাক, ইরাণ ও আফগানিস্তান এই তিনটি মুসলমান রাষ্ট্রের সঙ্গেও তুরস্ক সন্ধিবদ্ধ হয়।

কিন্তু নানা দেশের সঙ্গে সন্ধিতে আবদ্ধ হলেই তো আর সোয়াস্তি পাওয়া যায় না। আবিসিনিয়া ও ইটালীর ভিতরে সন্ধি বলবৎ থাক্‌তেই তো একে অন্যের ঘাড় মট্‌কে দিয়েছিল। কূটনীতি দ্বারা যতটুকু সম্ভব তা কামাল আদায় করে নিতে কখনও পশ্চাৎপদ হন নি। তথাপি নিজ শক্তি না বাড়াতে পারলে চুক্তি বা সন্ধি, কিছুতেই কিছু ফল হয় না।

গত মহাযুদ্ধের পর দার্দ্দেনেলিস ও বস্‌ফরাস প্রণালী অরক্ষিত অঞ্চল বলে গণ্য হয়, অথচ এগুলি তুরস্কেরই মধ্যে। শত্রুর আক্রমণ ব্যাহত করতে হলে এদের সুরক্ষিত করা তার পক্ষে

একান্তই দরকার। গত ১৯৩৬ সালের মার্চ্চ মাসে হিটলার জোর করে জার্ম্মানীর ঐরূপ একটি অঞ্চল রাইনল্যাণ্ড দখল করেন। এ বিষয় তোমাদের পরে বল্‌ব। কামালের এতে বেশ সুবিধা হ'ল। তিনি রাষ্ট্র-সংঘের কাছে ঐ দু'টির কর্ত্তৃত্ব-ভার চাইলেন। মঁত্রো শহরে সভা হ'ল। তিনি বিনা আয়াসেই দার্দ্দেনেলিস ও বস্‌ফরাস রক্ষার ভার পেয়ে গেলেন। এক সময় যারা তুরস্কের অধীন ছিল বা শত্রু ছিল তাদের সঙ্গে তিনি বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলেছেন। বলকান উপদ্বীপের রাজ্যগুলিকে এক কথায় বলা হয় বলকান রাষ্ট্র। এরা মিলে যে বন্ধুত্বমূলক চুক্তি করে তার নাম বলকান আঁতাত। তুরস্ক, গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া ও রুমানিয়া এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এরা বেলগ্রেড শহরে একটি সম্মেলনে মিলিত হয়ে দেশ-রক্ষা ব্যাপারে একযোগে কাজ করতে সম্মত হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাসমরে বলকান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র তুরস্ক ছাড়া অন্য সকলেই জার্ম্মানীর কুক্ষিগত হয়। জার্ম্মানীর শ্রেষ্ঠতর রণশক্তির সম্মুখে তারা কিছুই করে উঠ্‌তে পারে নি।

তুরস্ক আত্মরক্ষা ব্যাপারে নিজ দায়িত্বের কথা মোটেই ভোলে নি। অবস্থিতি হিসাবে তার গুরুত্ব অনেকখানি। স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী প্রত্যেকটির দিকেই সে দৃষ্টি দিয়েছে। তুরস্ক সরকারীভাবে প্রায় দুই লক্ষ সৈন্য পোষণ করে; যুদ্ধ-বিমানপোত ও নৌবহরও তার রয়েছে।

নব্য তুর্কী

জার্ম্মানী পোল্যাণ্ডের উপর চড়াও হওয়ার পরই ইউরোপে দ্বিতীয় মহাসমর আরম্ভ হয়। এর প্রথম পর্ব্বে ব্রিটেন ও জার্ম্মানী এবং দ্বিতীয় পর্ব্বে জার্ম্মানী ও রুশিয়া সেখানে প্রবল প্রতিপক্ষ। তথাপি তুরস্ক সকলের সঙ্গেই মিত্রতা বজায় রেখে চলে। তুরস্ক ব্রিটিশ ও জার্ম্মান অর্থ সমানে পায়। জগতে প্রায় সকল রাষ্ট্রই মিত্রশক্তি ও অক্ষ-শক্তি কোন-না-কোনটির সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিল। এ অবস্থায় খাস ইউরোপে থেকেও তুরস্ক যে বহুদিন পর্য্যন্ত নিরপেক্ষতা বজায় রাখ্‌তে পেরেছিল তাঁতে তার দূরদর্শী কূটবুদ্ধিরই তারিফ করতে হয়। তবে শেষ দিকে যখন জার্ম্মানীর পতন আসন্ন হয় তখন তুরস্ক মিত্রপক্ষের সঙ্গেই একটি চুক্তি করে নিয়েছে।

এতে করে তুরস্ককে মহাসমরের কোন ঝুঁকি বহন করতে হয় নি, অথচ এর ফলে তার হয়ত কিছু সুযোগ সুবিধা হবে। বর্ত্তমান বছরের প্রথম দিকেই দ্বিতীয় মহাসমর শেষ হয়, আর এর সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপের পুনর্গঠন সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্র নেতাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা সুরু হয়। মঁট্রো চুক্তি বাতিল করে দার্দ্দেনেলিস প্রণালীতে যাতে রুশিয়ারও কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তার চেষ্টা চল্‌ছে। তুরস্ক সময় বুঝে মিত্রশক্তির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল, তাই তাকে বিশেষ কোন ত্যাগস্বীকার করতে হয় নি।

— এক —

ভের্সাই সন্ধি

এ পর্য্যন্ত তোমরা যে-সব দেশের কথা শুনেছ, তাদের সম্বন্ধে বল্‌তে গিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের কথাও কিছু কিছু এসে পড়েছে। তোমরা নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করবে জগতে পাঁচ-ছ'টি মহাদেশ আছে, তাদের ভিতর শুধু ইউরোপের কথাই কেন এসে পড়ল। এযুগে ইউরোপই জ্ঞান-বিজ্ঞানে সকল দেশের শীর্ষস্থানে পৌঁছেছে। এমন একদিন ছিল যখন সভ্যতায় ভারতবর্ষ, চীন, মিশর, আসিরিয়া, বেবিলন অন্য সব দেশের সেরা ছিল। তখন এদের প্রভাবও জগতে ছড়িয়ে পড়েছিল। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আজ চাকা ঘুরে গেছে। ভারতবর্ষকে 'সভ্য' করতে ইংরেজ এদেশে এসেছে! চীনকে 'সভ্য' করবার জন্য ইউরোপ আমেরিকা লালায়িত।

ভের্সাই সন্ধি

সমস্ত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্য্যাস নিয়ে ইউরোপে যে সভ্যতার উদয় হয়েছে তার দুই মূর্ত্তি আমরা লক্ষ্য করি— একটি ধ্বংস-মূর্ত্তি, আর একটি কল্যাণ-মূর্ত্তি। কল্যাণ-মূর্ত্তির চেয়ে ধ্বংস-মূর্ত্তির সঙ্গেই সকলে বেশী পরিচিত। অন্য দেশ জয় করতে বা অধীন রাখ্‌তে এই মূর্ত্তিই বিশেষ প্রকট। জগতে আজ যে দ্বন্দ্ব, কলহ, যুদ্ধ দেখা দিয়েছে তা এই মূর্ত্তিরই বহিঃপ্রকাশ। আগেকার যুগেও দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হ'ত। কিন্তু তখন ধ্বংসলীলা এত বহু-ব্যাপক ছিল না। অথবা ধ্বংস ও কল্যাণ একই জিনিষ থেকে উদ্ভূত না হওয়ায় সাধারণের চোখে এর বৈষম্য তেমন করে ধরা দিত না। তোমরা এরোপ্লেন নিশ্চয়ই দেখেছ। এরোপ্লেনের প্রচলনে লোক আজ খুবই উপকৃত। দু'দিনের পথ এখন দু' ঘণ্টায় যাওয়া যায়! কিন্তু এতে করে মুহূর্ত্তমধ্যে বহু গ্রাম জনপদ ধ্বংস করাও সম্ভব। উড়োজাহাজ থেকে বোমা ফেলে কত নর-নারী, কত অমূল্য সম্পদই না এ পর্য্যন্ত বিনষ্ট করা হয়েছে!

ছ' বছর পূর্ব্বে দ্বিতীয় মহাসমর আরম্ভ হয়। ইউরোপীয় সভ্যতার ধ্বংস-মূর্ত্তি এর মধ্যে আমরা দেখ্‌তে পেয়েছি। এরূপ আর একবার দেখা গিয়েছিল বিগত প্রথম মহাসমরে। তখন যুদ্ধ ইউরোপের ভিতরই একরকম সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাসমর বাধে সমস্ত জগৎ জুড়ে। এর মূল কারণ বুঝতে হলে তোমাদের অতীতের কথাও কিছু জানা দরকার।

বিগত প্রথম মহাসমরে এক পক্ষে ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী, জাপান ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র আর অন্য পক্ষে ছিল জার্ম্মানী অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও তুরস্ক। প্রথম পক্ষকে এক কথায় বলা হ'ত মিত্রশক্তি। রুশিয়াও প্রথমে এই দলে ছিল। কিন্তু স্বদেশে অন্তর্বিপ্লব আরম্ভ হলে রুশেরা দল ছেড়ে চলে যায়। অন্য ছোট ছোট রাষ্ট্র অধিকাংশই মিত্র-শক্তিদের পক্ষে ছিল। যুদ্ধে জার্ম্মানী ও তার সঙ্গীরা শেষ পর্য্যন্ত হেরে যায়। এরাই মহাসমরের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী—হ্বের্সাইয়ে বসে সাব্যস্ত করা হ'ল। হ্বের্সাই সন্ধিকে তাই ঠিক সন্ধি বলা চলে না, সত্য কথা বল্‌তে গেলে এক বিজিত পক্ষের উপর বিজয়ী মিত্র-শক্তিদের জবরদস্তিই বলতে হয়। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উইলসন বলেছিলেন, যুদ্ধশেষে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেই আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভ করবে। হ্বের্সাই সন্ধি দ্বারা কার্য্যতঃ একথা অস্বীকার করা হ'ল। জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সাম্রাজ্য ছেটে ফেলে নূতন নূতন রাষ্ট্র তৈরী করা হ'ল। জার্ম্মানী তার সমস্ত উপনিবেশই হারাল। খাস জার্ম্মানীর কতকটা ফ্রান্স, বেলজিয়ম, ডেনমার্ক, পোল্যাণ্ড প্রভৃতির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হ'ল। অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি কতকগুলি নূতন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও রুশিয়া অনেক দিন আগে পোল্যাণ্ডকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল। এবারে পোল্যাণ্ড আবার স্বাধীনতা পেল। অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী,

ভের্সাই সন্ধি

চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, ডানজিগ, লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া, এস্‌টোনিয়া এই রকম অনেকগুলি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হ'ল। জার্ম্মানীর উপনিবেশ আফ্রিকা ও এশিয়ায় ছড়ান ছিল। ইংরেজ ও জাপান এর বেশীর ভাগ নিয়ে নিল। জার্ম্মানীর সামরিক শক্তি বিলোপের ব্যবস্থা হ'ল। এক লক্ষের বেশী সৈন্য সে রাখতে পারলে না। নৌবহর তাঁকে সামান্যই রাখতে দেওয়া হ'ল এবং বিমান-বহর সমূলে নষ্ট করা হ'ল।

এর পর সেভার্স সন্ধিতে তুরস্কের দেশগুলিও তার হাতছাড়া হয়ে যায়, ইউরোপ থেকে তার অস্তিত্ব লোপের ব্যবস্থা হয়! তুরস্ক এ ব্যবস্থার কিরূপ প্রত্যুত্তর দিয়েছে তা তোমাদের একটু আগেই বলেছি। তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত আরবভূমি ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে বণ্টন করা হ'ল। যে-সব নূতন দেশ মিত্রশক্তিরা পেল তাদের নাম দেওয়া হ'ল 'ম্যাণ্ডেট' বা ক্ষমতাধীন রাষ্ট্র। এসব দেশ বাস্তবিকই এক একটি পরাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হ'ল। এরা কি রকম অধীন হয়ে পড়েছে প্যালেষ্টাইনের দৃষ্টান্ত থেকেই তোমরা তা বুঝতে পার। কিন্তু শাসনের উপযুক্ত হলে কাকে কাকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে সে প্রস্তাবও করা হয় এ সময়।

রুশিয়া ভের্সাই সন্ধিতে আদৌ যোগদান করে নি। সেখানে তখন বিপ্লব উপস্থিত। রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে সাম্যবাদমূলক শাসন প্রবর্ত্তনে তখন রুশেরা ব্যস্ত। এই রাজ্য 'লুঠের' ব্যাপারে

লাভবান হ'ল বিশেষ করে ব্রিটেন ও তার ডোমিনিয়নগুলি, ফ্রান্স ও জাপান। ইটালী কিন্তু কিছুই পেলে না। অথচ জার্ম্মান পক্ষ থেকে ইটালীকে ভাগিয়ে আনা হয়, যুদ্ধ শেষে তাকেও রাজ্য দেওয়া হবে এই আশা দিয়ে। অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও তুরস্কের অস্তিত্ব লোপ করে দেবার ব্যবস্থা হওয়ায় ক্ষতিপূরণের যত চাপ সবই পড়ল জার্ম্মানীর উপর। ন' হাজার ন'শ কোটি টাকার মত তাকে মিত্রশক্তিদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে স্থির হয়।

প্রেসিডেণ্ট উইলসন চৌদ্দ দফা শর্ত্তে মিত্রশক্তিদের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। এর একটি প্রধান শর্ত্তের কথা আগে উল্লেখ করেছি। আর একটি শর্ত্ত ছিল, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার জন্য একটি রাষ্ট্র-সংঘ প্রতিষ্ঠা করা। তিনি যখন বুঝলেন, রাষ্ট্র-সংঘ নিশ্চিত প্রতিষ্ঠিত হবে তখন তিনি ঐরূপ গ্লানিকর সন্ধিতে স্বাক্ষর করেন। যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু রাষ্ট্র-সংঘে যোগ দিতে অস্বীকার করলে। উইলসন এতে খুবই আঘাত পেলেন। এর কিছুকাল পরেই তিনি মারা যান।

দ্বিতীয় মহাসমরের ইউরোপীয় পর্ব্ব শেষ হয়েছে, প্রাচ্যে জাপানের উপর এখনও প্রবল আক্রমণ চল্‌ছে। এর মধ্যেই আবার ভাগবাটোয়ারা সুরু হয়েছে। সান ফ্রান্সিকোতে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশসমূহ পুনর্গঠন কল্পে এক দফা আলাপ-আলোচনা হয়ে গেছে। জার্ম্মানীর ব্যবস্থা এর মধ্যে পড়ে নি। সে সম্বন্ধে আলাদা ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে।

—দুই—

ইটালী

বিগত প্রথম মহাযুদ্ধে ইটালী বহু লক্ষ যুবক হারায়, ততোধিক লোক বিকলাঙ্গ হয়ে গৃহে ফিরে, আর টাকাও খরচ হয় তার অগণিত। কিন্তু ভের্সাই সন্ধিতে লুঠের মাল কিছুই সে পায় নি। এর ফলে ইটালীতে তীব্র বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। জাতির এই বিক্ষোভ থেকেই ফাসিজমের উৎপত্তি, আর মুসোলিনীর নেতৃত্ব লাভও সম্ভব হয় এই কারণেই। মুসোলিনী আগে ছিলেন সমাজতন্ত্রী দলের একজন চাঁই। ধনিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকের সংঘবদ্ধ করবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের আরম্ভে তিনি এ দল ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি যুদ্ধে যোগদানের পক্ষপাতী ছিলেন। দল হিসাবে সমাজ-তন্ত্রীরা ছিল এর ঘোর বিরোধী। যুদ্ধশেষে মুসোলিনী বুঝতে পারলেন, নেতাদের অক্ষমতা আর আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্ব কলহের দরুন বিশ্ব-দরবারে ইটালীর কোন স্থানই হবে না। তাই তিনি সর্ব্বত্র ফাসিষ্ট দল গঠন করে ইটালীর পুনর্গঠনের জন্য আন্দোলন সুরু করে দিলেন।

১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে মুসোলিনী শাসনভার নিজহাতে নিলেন। মুসোলিনীর কথা ইতিপূর্ব্বে এত বেশী করে শোনা যেত

যে, স্বতঃই লোকের মনে হ'ত তিনিই বুঝি ইটালীর রাজা। তা কিন্তু তিনি নন্। ইটালীরও রাজা আছেন, তাঁর নাম ভিক্টর ইমানুয়েল। আগে ইটালীতে পার্লামেণ্টারী শাসন প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় তাঁর ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। কিন্তু মুসোলিনীর ক্ষমতা বেড়ে যায় অসম্ভব রকম। কেমন করে তিনি নিজ ক্ষমতা বাড়িয়ে নিলেন তা তোমাদের এখন বলব।

মুসোলিনী ইটালীকে পুনর্গঠিত করে, একে করে তুল্‌লেন একটি 'করপোরেটিভ ষ্টেট'। তিনি দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষামূলক কার্য্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়কে কতকগুলি 'করপোরেশন' বা সমবায়ে বিভক্ত করলেন। জমিদার-প্রজা, ধনিক-শ্রমিক উভয়ের প্রতিনিধি নিয়ে এই সব-কমিটি গঠিত হ'ল। নিজ নিজ সীমার ভিতরে এরাই কর্ত্তা। পরস্পরের বিবাদ বিসম্বাদ এরাই মিটমাট করে নেয়। করপোরেশনগুলির সকলের উপর হ'ল ষ্টেট-করপোরেশন, তার সভাপতি হলেন মুসোলিনী স্বয়ং। বিভিন্ন করপোরেশনে ফাসিষ্ট দলেরই প্রাধান্য। কাজেই জাতীয় জীবনের সমুদয় বিভাগই ধীরে ধীরে মুসোলিনীর হাতে চলে এল। তিনি পার্লামেণ্টকে একেবারেই তুলে দেন নি, একে ক্রমে শক্তিহীন করে তুলেছিলেন।

নির্ব্বাচন প্রথায়ও আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। বিভিন্ন করপোরেশন নিজ নিজ কেন্দ্রের সদস্যদের তালিকা প্রস্তুত

করে ফাসিষ্ট গ্রাণ্ড কাউন্সিলে পাঠায়। মুসোলিনীর অন্তরঙ্গদের নিয়েই এই ফাসিষ্ট গ্রাণ্ড কাউন্সিল গঠিত। এই সভা ঐ সব তালিকা থেকে চার শত নাম বাছাই করে নির্ব্বাচনের জন্য সাধারণের নিকট উপস্থিত করে। সাধারণে 'হঁা' বা 'না' বলবারই শুধু অধিকারী। তারা এতে প্রায়ই সম্মতিই দিয়ে থাকে। বছরে কখনো কখনো 'পার্লামেণ্ট' ডাকা হয় বটে, কিন্তু তাদের হাতে এখন আর কোন ক্ষমতা নেই। ফাসিষ্ট গ্রাণ্ড কাউন্সিলই আইন-কানুন প্রণয়ন, যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিচালন প্রভৃতি কার্য্য জাতির তরফ থেকে করে থাকে। ফাসিষ্ট গ্রাণ্ড কাউন্সিল মাঝে মাঝে বসে। কিন্তু মুসোলিনীর কথায়ই সায় দিয়ে চলে। সমস্ত বিরুদ্ধ মত উচ্ছেদ করে দিয়ে মুসোলিনী এইরূপে নিজে শক্তি দৃঢ় করেন। তিনি দেশের উন্নতিকল্পে যে-সব ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন তাতে অল্পকালের ভিতরেই জাতি তার হৃত শক্তি ফিরে পেলে, ইটালী একটি বড় শক্তি হয়ে দাঁড়াল।

কয়েক বছর পূর্ব্বেই ইটালীর পররাষ্ট্র-নীতি বিশ্ববাসীর আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠে। গত যুদ্ধে বিজেতাদের দলে থেকেও সে হয়েছিল সবরকম সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এ আঘাত জাতির অন্তরতম প্রদেশে গিয়ে পৌঁছয়। মুসোলিনী জাতির এ তীব্র মনোভাবের ষোল আনা সুযোগ নিয়ে এক দিকে যেমন নিজের শক্তি দৃঢ় করলেন, অন্য দিকে তেমনি

জাতির পররাষ্ট্র-নীতিও নূতন করে গঠন করতে সুরু করলেন। তিনি ১৯২৫ সালে ইংরেজকে দিয়ে প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়ে নিলেন যে, ভের্সাই সন্ধির সময় ইটালীর কথায় কর্ণপাত না করায় মিত্রশক্তির পক্ষে তার প্রতি ঘোরতর অন্যায়ই করা হয়েছে।

এই অন্যায় প্রতিকারের পূর্ব্বে ইউরোপে নিজ শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল। ফ্রান্স মধ্য ইউরোপে তার ক্ষমতা বিস্তার করছিল এই সময়ে। ইটালীর তা মোটেই ভাল লাগে নি। অথচ তার এমন শক্তি ছিল না যে, সে তাকে বাধা দেয়। অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীকে হাতে রাখা ইটালীর একটা প্রধান কর্ত্তব্য বলে গণ্য হ'ল। পূর্ব্ব-দক্ষিণ ইউরোপে ইটালীর ব্যবসা অবশ্য খুবই বেড়ে গেল। ক্ষুদ্র আলবেনিয়া তারই তাঁবেদার হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু এতে তার সাম্রাজ্য ক্ষুধা মিটল না। উত্তর-পূর্ব্ব আফ্রিকায় আবিসিনিয়ার উপর তার অনেক দিনের লোভ। ১৮৯৬ সালে একবার একে আক্রমণ করে হাব্‌সিদের হাতে ভীষণভাবে পরাজিতও হয় ইটালী। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির চক্রান্তে সে পরেও সেখানে কিছুই করে উঠতে পারে নি। গত ১৯২৮ সালে ইটালী ও আবিসিনিয়া একটি বন্ধুত্বমূলক সন্ধিতে আবদ্ধ হয়। তখন কে ভেবেছিল কয়েক বছরের মধ্যেই ইটালী অমন করে আবিসিনিয়ার উপরে চড়াও হবে?

ইটালী

তুর্কীর বেলায় তোমাদের বলেছি যে, তারা ইটালীকে খুবই ভয় করে চলত। গত যুদ্ধের আগে থেকেই তুরস্কের এশিয়া মাইনরের উপর ইটালীর লোভ ছিল। সেভার্স সন্ধিতে যখন তুরস্ককে উচ্ছেদ করা ঠিক হ'ল, তখন পূর্ব্ব-বাঞ্ছিত এশিয়া মাইনর লাভ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে বলে বোধ হ'ল। কিন্তু কামাল আতাতুর্কের আবির্ভাবে সে সাধ আর মিট্‌ল না। এশিয়া মাইনরে সে কোন পাত্তাই পেলে না। তবে ইটালী তুরস্কের ঘরের হুয়ারে ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপগুলি সুরক্ষিত করে রেখেছিল। এখান থেকে তুরস্ককে আক্রমণ করা খুবই সুবিধা।

মুসোলিনী ইটালীর পররাষ্ট্র-নীতিকে মোড় ফিরিয়ে দিলেন। ইউরোপ বা এশিয়ার কোন দেশের উপর তিনি লোভ কর্‌লেন না। তাঁর নজর পড়ল নূতন বন্ধু আবিসিনিয়ার উপর। তুচ্ছ ছুতা ধরে তার বিরুদ্ধে তিনি নিষ্ঠুর অভিযান চালালেন। ইটালী কয়েক বছর ধরেই তার অস্ত্রশস্ত্র বাড়িয়ে নিচ্ছিল। লোকে তখন জিজ্ঞাসা করত যে, সে এত অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে কি করবে? এতদিনে বুঝা গেল ইটালীর অতৃপ্ত সাম্রাজ্য-পিপাসাই অস্ত্রশস্ত্র বাড়াবার একমাত্র কারণ। ফ্রান্স এ সময় (১৯৩৫, ২রা জানুয়ারী) ইটালীর সঙ্গে একটি সন্ধি করে এবং এতদ্বারা ইটালীকে আফ্রিকায় কিছু সুখ-সুবিধা দিতে স্বীকৃত হয়। কেউ কেউ বলেন, মুসোলিনীর আবিসিনিয়া অভিযানেও ফ্রান্সের সহানুভূতি ও সম্মতি ছিল। আবিসিনিয়া আক্রমণের

পরে কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্স উভয়েই ইটালীর বিরুদ্ধে বেঁকে বসে ও রাষ্ট্র-সঙ্ঘের মারফত তার ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়ে আর্থিক শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করে। কিন্তু এ ব্যবস্থা যতখানি অবলম্বন করলে ইটালী আবিসিনিয়া-অভিযান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হ'ত তা তারা করে নি। ইটালী আকাশ থেকে বিষাক্ত গ্যাস ফেলে ও বোমা ছুড়ে স্বাধীন আবিসিনিয়াকে নিজ অধিকারভুক্ত করে নিলে। এ কাহিনী বড়ই নির্ম্মম। আমাদের স্বদেশবাসীও সেখানে ছিল অনেক। তারাও খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই যুদ্ধবিগ্রহের জন্য। আবিসিনিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক বহু দিনের। হিন্দুদের শাস্ত্রগ্রন্থাদির অনেক স্থলে এর উল্লেখ আছে। হাব্‌সিরা তাদের দেশকে বলে 'ইথিওপিয়া'।

ইংরেজ ও ফরাসীদের উপরও ইটালীর বিদ্বেষ খুব বেড়ে গেল। মুসোলিনীর ব্যবহারে এতকাল ইংরেজ ও ফরাসীরা এক রকম খুশীই ছিল। কারণ মুসোলিনী ইটালী থেকে সাম্য-বাদকে সমূলে উচ্ছেদ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তাদের সাহায্যে শক্তিমান হয়ে যখন তিনি সাম্রাজ্য বাড়াতে চাইলেন তখন তারা বাধা না দিয়ে পারে নি। এতে যে তাদের স্বার্থ-হানির খুবই সম্ভাবনা! তাই মুসোলিনী আবিসিনিয়া বিজয়ের পর থেকে অন্য বন্ধু খুঁজতে লাগলেন।

তিনি বন্ধু পেলেনও। মহাযুদ্ধের পর বিধ্বস্ত জার্ম্মানীতে আবির্ভাব হ'ল হিটলারের। মুসোলিনীর আবিসিনিয়া বিজয়ের

ইটালী

আগেই হিটলার জার্ম্মানীর কর্ত্তা হয়ে বসেছিলেন। ইংরেজ-ফরাসী যখন ইটালীর বিরুদ্ধে আন্দোলনে লিপ্ত তখন তিনি তাদের সঙ্গে যোগ দেন নি। আবিসিনিয়া বিজয়ের পরই মুসোলিনী কালবিলম্ব না করে তাঁর সঙ্গে মিতালী করে নিলেন।

জার্ম্মানীতে হিটলারের অভ্যুদয় মুসোলিনী প্রথমে ভাল চক্ষে দেখেন নি। অষ্ট্রিয়াকে মুসোলিনী বরাবর নিজের তাঁবে রাখতে চেয়েছিলেন। এ দেশটির উপর ছিল হিটলারের খুবই লোভ। মুসোলিনী যখন দেখলেন রাজ্য-বিস্তার ব্যাপারে ইংরেজ-ফরাসী তাঁর বিরোধী হয়েছে, এবং ভবিষ্যতেও হবার আশঙ্কা আছে তখন তিনি 'অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' নীতি অবলম্বন করলেন। অর্থাৎ অষ্ট্রিয়ার উপর সমস্ত দাবি দাওয়া ত্যাগ করে হিটলারের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন। ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে সন্ধি হ'ল অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মানীর ভিতর। বিশেষজ্ঞরা একে কিন্তু জার্ম্মান-ইটালীয় সন্ধি বলেই উল্লেখ করেছেন। কেননা মুসোলিনীই ছিলেন এই সন্ধির মূলে।

ইটালী ও জার্ম্মানীর মধ্যে বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ। এই বন্ধুত্বের নামকরণ হয়—'রোম-বার্লিন এক্সিস' বা 'রোম-বার্লিন অক্ষ'। কোন নির্দ্দিষ্ট শর্ত্তে যে এই বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল তা নয়, উদ্দেশ্য-সাম্যই উভয়কে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলে। হিটলার রাজ্য চান, মুসোলিনীও রাজ্য চান—কাজেই উদ্দেশ্য-সাম্য নয় তো কি? মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপ থেকে মুসোলিনী হাত

গুটালেন। হিটলার তাঁর সম্মতি নিয়ে অষ্ট্রিয়া দখল করে নিলেন, তাঁর সাহায্যেই চেকোশ্লোভাকিয়ার কতক অংশ তিনি পেয়ে যান। মুসোলিনীর নজর দক্ষিণ দিকে। আফ্রিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হলে ভূমধ্যসাগরে কর্তৃত্ব স্থাপন করা দরকার। কিন্তু স্পেনের উপরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা না হলে এ সম্ভব হবে কিরূপে? তাই হিটলারের সঙ্গে একযোগে স্পেন-গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে বিদ্রোহী নেতা ফ্রাঙ্কোকে ধন-জন-অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করলেন। ফ্রাঙ্কোর জয় যখন নিশ্চিত হয়ে এল তখন মুসোলিনী নিজশক্তির পরিমাপ করে নিয়ে ফ্রান্সের নিকট থেকে কতকগুলি রাজ্য ও সুযোগ-সুবিধা দাবি করে বসলেন। নাইস্, কর্সিকা, টিউনিস, সুয়েজ, জিবুতি এই কয়টি অঞ্চলের উপরই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল। এতে শুধু ফ্রান্স নয়, ব্রিটেনও বিচলিত হয়ে উঠল।

ইটালীর প্রতি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের, বিশেষ করে ব্রিটেনের মনোভাব কি ছিল তা তোমাদের এখন বলব। আবিসিনিয়া অভিযানের সময় থেকে ফ্রান্স ও ইটালীর ভিতর মনোমালিন্য রয়েই যায়, তা দূর করবার বিশেষ কোন চেষ্টা করা হয় নি। এর উপর ইটালীর উক্ত দাবিতে এদের ভিতরকার মনোমালিন্য আরো বেড়ে চলে। কিন্তু ব্রিটেনের মনোভাবের খুবই পরিবর্তন ঘটল। আবিসিনিয়া বিজয়ের অব্যবহিত পরেই ব্রিটেনের চেষ্টায় রাষ্ট্র-সংঘ ইটালীর প্রতি শাস্তি দান ব্যবস্থা রদ করলেন। মুসোলিনীও ভূমধ্যসাগরে ইংরেজের ন্যায্য দাবি স্বীকার করে

নিলেন। মুসোলিনী ও হিটলারের স্পেন-বিদ্রোহীদের সাহায্য করার মূল উদ্দেশ্য যা-ই থাকুক, মুখে কিন্তু তাঁরা এমন একটি কথা বল্‌লেন যাতে ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা তা সমর্থন না করে পারলে না। বস্তুতঃ বিদ্রোহ আরম্ভ হবার কয়েক মাস আগে স্পেনে সোভিয়েট রুশিয়ার আদর্শে সাম্যবাদমূলক শাসন প্রবর্ত্তিত করবার চেষ্টা হয়। সাধারণ নির্ব্বাচনের পর সমাজ-তান্ত্রিক ও সাম্যবাদী দলের সভ্যদেরই প্রাধান্য হয় স্পেনের পার্লামেণ্ট 'কোর্টেজ'-এ। পাছে সেখানে সাম্যবাদ প্রবর্ত্তিত হয় এই আশঙ্কায় ব্রিটেন ও ফ্রান্স স্পেন-সরকারকে সাহায্য না করে যাতে সে অন্য কারো কাছে থেকেও সাহায্য না পায় তারই ব্যবস্থা করলে। মুসোলিনী ইংরেজের মনোভাবের ভিতর নিজ উদ্দেশ্যের উপযোগী বস্তুই খুঁজে পেলেন।

তখন নেভিল চেম্বারলেন ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী। মুসোলিনী ও তাঁর মধ্যে পত্র-বিনিময় ও আলোচনাদির পর ইঙ্গ-ইটালী মৈত্রী সংঘটিত হ'ল ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে। পরবর্ত্তী নবেম্বর মাস থেকে এ সন্ধি কার্য্যকরী হয়। ইংরেজ ইটালীর আবিসিনিয়া-বিজয় মেনে নিলে। সমরায়োজন সম্পর্কে প্রত্যেকেই প্রত্যেককে সব জানাবে, সন্ধির এ ছিল একটি প্রধান শর্ত্ত। ইটালী ফ্রান্সের অধিকৃত কোন কোন অঞ্চল আবার দাবি করলে। এর পরই চেম্বারলেন মহোদয় রোমে গিয়ে মুসোলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, কিন্তু এ দাবি সম্পর্কে কোন মীমাংসা

হয় নি। ইঙ্গ ইটালীয় চুক্তির আর একটা শর্ত্ত ছিল—উত্তর আফ্রিকাস্থ ইটালীর উপনিবেশ লিবিয়া থেকে সৈন্য সরিয়ে নেওয়া। অতটুকু জায়গায় লক্ষাধিক সৈন্য জড় করে রাখা হয়েছিল! ইটালী সৈন্যও কিছু সরিয়ে নিযেছিল। কিন্তু কিছু পরেই আবার সেখানে নূতন করে সৈন্য সমবেত করা সুরু হয়।

জার্ম্মানীর সঙ্গে মিত্রতা হবার পর থেকে ইটালী তাকে নানা ভাবেই সাহায্য করে। দ্বিতীয় মহাসমরের প্রথম দিকে সে কি ব্রিটেন-ফ্রান্স, কি জার্ম্মানী কোন পক্ষেই যোগ না দিয়ে বাহ্যতঃ নিরপেক্ষ ছিল বটে, কিন্তু প্রকাশ্যে ও গোপনে সকল রকমেই জার্ম্মানীকেই সাহায্য করে। ইটালীও জার্ম্মানীর মত সোভিয়েট রুশিয়ার উপর বিরূপ ছিল, এবং জার্ম্মানী ও রুশিয়ার মধ্যে সন্ধি নিষ্পন্ন হলেও ইটালী কখনও রুশিয়ার মিত্রতা কামনা করে নি। বরং ঐ মিতালীর সুযোগ নিয়ে রুশিয়া যখন প্রতিবেশী ফিনল্যাণ্ডের উপর চড়াও হয় তখন সৈন্য ও রসদ দিয়ে নানা ভাবে ফিনদেরই সে সাহায্য করে। রুশিয়া দক্ষিণে ভূমধ্য-সাগরের দিকে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করে এটাও সে চায় নি। তার বিরুদ্ধে বলকান রাষ্ট্রগুলিকে সংঘবদ্ধ করতেও তার বিশেষ চেষ্টা চলে।

কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হবার মাত্র পাঁচ মাস পরে ১৯৪০, জুন মাসে জার্ম্মান-বাহিনী কর্ত্তৃক ফ্রান্স আক্রমণের মুখে ইটালী সুযোগ বুঝে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ও নিজে বলকান

রাজ্যসমূহের দিকে অগ্রসর হ'ল। আল্‌বানিয়া অধিকার করে গ্রীসের দিকে অগ্রসর হলে সে বিশেষ ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় ও গ্রীসের হাতে পরাজিত হয়। মিত্রশক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেই আবিসিনিয়ার ইটালীয় বাহিনী ভারত-মহাসাগর তীরে ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ড দখল করেছিল। কিন্তু ব্রিটিশ-বাহিনী অল্পকাল মধ্যেই উত্তরে লিবিয়ায় ও উত্তর-পূর্ব্বে এরিট্রিয়া, আবিসিনিয়া ও সোমালিল্যাণ্ডে ইটালীয় বাহিনীকে হারিয়ে দেয় ও বহু সহস্র ইটালীয় সেনা বন্দী করে। এর পর থেকেই ইটালীর যুদ্ধশক্তির উপর লোকের আস্থা চলে যায়। মিত্র-শক্তিবর্গ পুনরায় আবিসিনিয়া রাজ্য পূর্ব্ব-সম্রাট হাইলে সেলাসিকে অর্পণ করে (মে, ১৯৪১)

এসময় থেকেই অতি দ্রুত ইউরোপের রাজনৈতিক পট পরিবর্ত্তিত হতে লাগল। ফ্রান্সের পতন, বলকান অভিযান ও রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও সেখানে অগ্রগতি প্রভৃতি ব্যাপারে জার্ম্মানীর শক্তি যেন অপরাজেয় হয়ে উঠ্‌ল। উত্তর-পূর্ব্ব আফ্রিকায় পরাজয়ে ইটালীর যে দুর্নাম রটেছিল তা খানিকটা দূর করার জন্যই যেন হিটলার প্রসিদ্ধ সেনানায়ক রোমেলের অধীনে জার্ম্মানী ও ইটালীর সেনাদল সেখানে পুনরায় প্রেরণ করলেন। এসময় জার্ম্মানীর কার্য্য-কলাপ দেখে সকলের মনে হতে লাগ্‌ল যে, ইটালীর আভ্যন্তরিক ব্যাপারেও তার ক্ষমতা যেন সু-প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। মোটামুটি দু'বছর কাল এই উত্তর-আফ্রিকা

অভিযান চলে। অক্ষশক্তি-বাহিনী তড়িৎ গতিতে অভিযান চালায় এবং পূর্ব্ব দিকে মিশরের সীমানাও অতিক্রম করে!

কিন্তু তাদের এই জয়লাভ বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। ইউরোপে রুশদের নিকট জার্ম্মানবাহিনীর অগ্রগতি ব্যাহত এবং সেখানেই অধিক সৈন্য মজুত রাখ্তে বাধ্য হওয়ায় জার্ম্মানীর পক্ষে উত্তর-আফ্রিকায় নূতন সৈন্য প্রেরণ কঠিন হয়ে উঠে। ওদিকে পশ্চিম আফ্রিকায় লক্ষাধিক মার্কিন সেনা অবতরণ করে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক হতে মিত্রবাহিনীর যুগপৎ আক্রমণে অক্ষ-বাহিনী শেষ পর্য্যন্ত রণে ভঙ্গ দিয়ে স্বদেশে ফিরে আস্‌তে বাধ্য হয় (মে, ১৯৪৩)।

এর পরই ইটালীর রাষ্ট্রীয় জীবনে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। মিত্রবাহিনী উত্তর-আফ্রিকা থেকে খাস ইটালী আক্রমণে উদ্যোগী হয় এবং সিসিলিতে যখন উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলে সেই সময় ১০ই জুলাই, ১৯৪৩ ইটালীর রাজধানী রোম এবং অন্যান্য স্থানেও মিত্রবাহিনী বিমান থেকে প্রচুর বোমা বর্ষণ করে। এর ফলে সমগ্র ইটালীতেই ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হ'ল। পক্ষকালের মধ্যেই (২৫শে জুলাই) মুসোলিনী পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। তাঁর স্থলে মার্শাল বাদোগলিও ইটালীর প্রধান মন্ত্রী হলেন।

পরবর্ত্তী আগষ্ট মাসের মধ্যেই ইটালীয় সরকার ফাসিদল ভেঙে দিয়ে দলের সমস্ত টাকাকড়ি কেড়ে নিলেন। ফাসি

ইটালী

নেতৃবৃন্দ, মায় মুসোলিনী, কারারুদ্ধ হলেন। ইটালীয় পক্ষে বাদোগলিও এবং মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে পরবর্ত্তী ৩রা সেপ্টেম্বর যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'ল। ওদিকে হিটলারও বসে ছিলেন না। তিনি উত্তর ইটালীর দিকে সেনা-বাহিনী প্রেরণ করলেন। মিত্রপক্ষ বেগতিক দেখে ৮ই সেপ্টেম্বর ইটালীতে সৈন্যদল নিয়ে হাজির হলেন। ইটালীও ঐদিনই মিত্রপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করলে। এসব কাজ যেন নাটকীয় ভাবেই সমাধা হ'ল! হিটলার বিমান থেকে প্যারাসুট বাহিনী নামিয়ে মুসোলিনীকে কারাগার থেকে উদ্ধার করে ইটালীতেই মিত্রশক্তি-বাহিনীর সঙ্গে জোর সংগ্রাম সুরু করে দেন। উত্তর ইটালী তখন তাঁরই হস্তগত হয়। এরপর বৎসরাধিক কাল জার্ম্মানীকে একাই যুদ্ধ করতে হয় বিভিন্ন রণ প্রাঙ্গনে। শেষ পর্য্যন্ত জার্ম্মানীর হার হয়। ইটালীও মিত্রশক্তি কবলিত হয়। ইটালীর ফাসি বিরোধী একদল মুসোলিনী ও তাঁর প্রধান সহচরগণকে জাতির শত্রু বলে হত্যা করে ফেলে। দ্বিতীয় মহাসমর ইউরোপ ক্ষেত্রে পরিসমাপ্ত হলেও বিজিত দেশগুলি সম্বন্ধে এখনও বিশেষ কোন স্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নি। এ কিঞ্চিৎ সময় সাপেক্ষ।

—তিন—

জার্ম্মানী

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে লুঠের মাল বণ্টনের সময় ইটালীর উপর খুবই অবিচার করা হয়েছিল, কিন্তু জার্ম্মানীর প্রতি যে ব্যবহার করা হয়েছিল তার তুলনাই হয় না। জার্ম্মানী তখন অপরাধীর কাঠগড়ায়। যুদ্ধের যত দোষ তার একার উপর চাপান হ'ল। ইংরেজ, ফরাসী প্রমুখ মিত্রশক্তিরা যে কখনো কোন অন্যায় করেছে বা করতে পারে একথা তখন তোলাই হ'ল না। কাজেই ভেরসাইি সন্ধিতে জার্ম্মানীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধবার সব রকম ব্যবস্থাই হ'ল।

প্রেসিডেণ্ট উইলসন বলেছিলেন, ইউরোপে এক একটি জাতি নিয়ে এক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হবে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, এই ভাবে রাজ্য গঠিত হলে এখানকার দ্বন্দ্ব-কলহের অবসান হবে। কিন্তু কার্য্যকালে তা হয় নি। জার্ম্মানী থেকে বহু অংশ ছেটে অন্য রাজ্যের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হ'ল —যে-সব স্থলে জার্ম্মানদেরই বাস বা সংখ্যায় জার্ম্মানদেরই আধিক্য। আল-সেস-লোরেন দেওয়া হ'ল ফ্রান্সকে, বেলজিয়ম পেলে ইউপেন ও মালমেডি। লিথুয়ানিয়ার সঙ্গে পরে যুক্ত করে দেওয়া হয় মেমেল। ডেনমার্কও এর খানিকটা পেলে। পূর্ব্ব জার্ম্মানীর একটি

বিশেষ অংশ নিয়ে পোল্যাণ্ডের সৃষ্টি করা হ'ল। পূর্ব্ব প্রুশিয়া মূল জার্ম্মানী থেকে আলাদা হয়ে রইল। আপার সাইলেসিয়ার বেশীর ভাগই পেল পোল্যাণ্ড। চেকোশ্লোভাকিয়ার ভাগে কিন্তু পড়ে এর সামান্যই। পশ্চিম জার্ম্মানীর সার নামে একটি জায়গা রাষ্ট্র-সংঘ নিযুক্ত কমিশনের অধীন করা হয়। তখন কথা হয় যে, পনর বছর পরে গণ-ভোট দ্বারা স্থির করা হবে, সারবাসীরা জার্ম্মানীর সঙ্গে যুক্ত হবে কি না। জার্ম্মানী তার সমস্ত উপনিবেশও হারালে। এর কিছু পরে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ তার স্কন্ধে চাপান হ'ল বহু সহস্র কোটি টাকার ঋণ-ভার!

জার্ম্মানী এরূপ ব্যবস্থায় আপত্তি জানিয়েছিল, কিন্তু তখন সে নিরুপায়; শেষ পর্য্যন্ত সবই তাকে মেনে নিতে হয়। মিত্র-শক্তিদের ইচ্ছা অনুযায়ী জার্ম্মানী অতঃপর একটি রিপাব্লিক বা গণতন্ত্রে পরিণত হ'ল। সম্রাট উইল্‌হেলম কাইজার আগেই দেশ ছেড়ে হল্যাণ্ডে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ইনি কে বলতে পার? মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কথা তোমরা নিশ্চয়ই জান। ইনি তাঁরই দৌহিত্র,—রাজা পঞ্চম জর্জ্জের পিসতুত ভাই। ১৯১৯ সালের জুলাই মাসে ওয়াইমার নামক শহরে বসে জার্ম্মান রিপাব্লিকের নিয়মতন্ত্র রচিত হয়। এজন্য একে বলা হ'ল ওয়াইমার রিপাব্লিক। প্রেসিডেণ্ট, মন্ত্রীসভা ও রাইখ্‌ষ্টাগ বা পার্লামেণ্ট—এই নিয়ে গবর্ণমেণ্ট গঠিত হ'ল। প্রেসিডেণ্ট গণ-ভোট দ্বারা নির্ব্বাচিত হবার কথা হয়। সমগ্র সাবালক

নর-নারী রাইখ্ষ্টাগের সদস্য নির্ব্বাচন করবার ক্ষমতা পেলে। হিটলারের আবির্ভাব পর্য্যন্ত জার্ম্মানীতে দুইজন প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন—প্রথম ফ্রেডারিক এবার্ট, দ্বিতীয় ফন্ হিণ্ডেনবুর্গ। হিণ্ডেনবুর্গের জীবিতকালেই হিটলার চ্যান্সেলর বা প্রধান মন্ত্রী হন। তাঁর মৃত্যুর পর হিটলার প্রেসিডেণ্ট ও চ্যান্সেলর দুই-ই হলেন। তিনি এখন থেকে নাম নিলেন 'ফুর্হের' বা জাতির নেতা।

ভের্সাই সন্ধির পর থেকে হিটলারের 'ফুর্হের' হওয়া পর্য্যন্ত এই ষোল বছর জার্ম্মানীর আত্ম-সংগঠনের যুগ। মিত্রশক্তিরা যুদ্ধে জয়লাভ করলে বটে, কিন্তু জার্ম্মানীর শক্তির পরশ তারা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছিল। সে পুনরায় যাতে মাথা তুলতে না পারে তারই ব্যবস্থা করা হয়েছিল ভের্সাই সন্ধিতে। সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি তার থেকে কেড়ে নেওয়া হ'ল, উপরন্তু ক্ষতি-পূরণের এমন বোঝা তার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হ'ল যা শোধ করা ছিল তার পক্ষে সাধ্যাতীত। জার্ম্মানী নির্দ্দিষ্ট হারে ক্ষতিপূরণ করছে না এই অজুহাতে ফরাসীরা তার রূঢ় প্রদেশ দখল করে নিল। ইতিমধ্যে জার্ম্মানীর উপর ব্রিটেন ও আমেরিকার মনোভাব অনেকটা বদলে গেল। ফ্রান্সের এ কাজ তারা সমর্থন করলে না। কিছুকাল পরে ফ্রান্স তার সৈন্য রূঢ় থেকে তুলে নেয়। এর পরে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী, বেলজিয়ম ও জার্ম্মানীর ভিতর লোকার্নো চুক্তি

বিধিবদ্ধ হয়। এর প্রধান শর্ত্ত ছিল—কেউ কাউকে আর অতঃপর আক্রমণ করবে না। বিশেষজ্ঞরা বলেন, গত মহাসমর এই সময়ে সত্যি সত্যি শেষ হয়েছে।

জার্ম্মানী সমর-ঋণ শোধ করতে অপারগ দেখে মিত্র শক্তিদের যেন তার উপর কতকটা দয়া হ'ল। 'ডস্' নামক একজন মার্কিন অর্থনীতিবিদের নেতৃত্বে ঋণ শোধের একটি পরিকল্পনা স্থির হয়, এর নাম হ'ল 'ডস্ প্ল্যান'। এতে ধার্য্য হয় যে, মিত্রশক্তিরা জার্ম্মানীর শিল্প কারখানায় টাকা ঢালবে, আর এর লাভের অঙ্ক থেকে সে কিস্তি মত সুদ ও ক্ষতিপূরণ দুই-ই দেবে! অতঃপর জার্ম্মানীর শিল্প-বাণিজ্যের বেশ উন্নতি হ'ল। জার্ম্মান জনসাধারণ কিন্তু এর দ্বারা বিশেষ উপকৃত হ'ল না, বরং তাদের ভিতরে বেকার সংখ্যা ক্রমে বেড়েই চল্‌ল। কেমন করে বেড়ে গেল জান? কারখানায় উন্নত ধরণের যন্ত্র ব্যবহৃত হলে জনমজুর কমই দরকার হয়। কাজেই তারা বেকার হয়ে পড়ে। আজকের যন্ত্র যুগে একে একটা অভিশাপ বল্‌তে হবে। সাধারণের করভারও বেড়ে গেল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতেই যদি সব নিঃশেষ হয়ে যায় তা'হলে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হবে কিরূপে? কয়েক বছর নানাভাবে চেষ্টা করার পরে ১৯৩১ সালে ক্ষতিপূরণ দেওয়া থেকে জার্ম্মানী রেহাই পায়। কিন্তু তখন সমস্ত জগতেই ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা দেখা দিয়েছে, জার্ম্মানীর অবস্থা ফেরবার আশাই রইল না।

ভের্সাই সন্ধি জার্ম্মান জাতির গলায় কাঁটার মত বিঁধছিল। এ থেকে যে-সব প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছিল তার উপর ছিল তার স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা। লোকার্নো চুক্তির পর জার্ম্মানী রাষ্ট্র-সংঘের সভ্য হ'ল বটে, কিন্তু রিপাব্লিকের উপর জার্ম্মানদের বিতৃষ্ণা বেড়েই চলল। তারা মনে প্রাণে এর উচ্ছেদ কামনা করত। হিটলার এই সময়ে নাৎসী দলের মারফৎ জাতির মনোভাব ব্যক্ত করলেন—'সব অন্যায়ের মূল ভের্সাই সন্ধি, একে নাকচ করতে হবে,—সঙ্গে সঙ্গে যারা এতে সাহায্য করেছিল সেই সব ইহুদীদের করতে হবে নিপাত, আর পরাজয়ের গ্লানি থেকে যে শাসন ব্যবস্থা তৈরী হয়েছে তাও করতে হবে ধ্বংস। এই তিনটি মূল মন্ত্র নিয়ে হিটলার আসরে অবতীর্ণ হলেন। একে একে সব বাধা বিপত্তি তিনি উৎরে গেলেন। জার্ম্মানীর প্রতি মিত্রশক্তিদের, বিশেষ করে ফ্রান্সের ব্যবহার আর বিশ্বব্যাপী বাজার-মন্দা তাঁকে সঙ্কল্পের পথে অনেকটা এগিয়েই দিয়েছিল। ১৯৩৩ সালে প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গ জার্ম্মানীর শাসন ভার হিটলারের হাতে তুলে দিলেন।

হিটলার ও মুসোলিনীর আদর্শ একই। মুসোলিনী ইটালীর জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন হিটলারও জার্ম্মানীতে সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে উদ্যোগী হন। তিনি তাঁর আত্মজীবনী 'মে ক্যাম্পে' এ কথা স্পষ্টই বলেছেন। ফাসিবাদের আদর্শে দেশের সর্ব্বত্র নাৎসী দলের শাখা গঠন করলেন। 'ষ্টর্ম ট্রুপার'

বা ঝটিকাবাহিনী গঠিত হ'ল। জার্ম্মানীতে একটি দলের বেশী থাকতে দেওয়া হ'ল না। অন্য কোন দল সভা করতে থাকলে এই ঝটিকাবাহিনী তা ভেঙে দিত। শাসন-ভার গ্রহণ করে হিটলারের প্রথম কাজ হ'ল অন্য সব দলের বিলোপ সাধন। জার্ম্মানীতে সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী দলের প্রাধান্য ছিল খুবই! আর এদের পৃষ্ঠপোষক ছিল সোভিয়েট রুশিয়া। এ দলগুলিকে ব্যাহত করবার জন্য দেশী বিদেশী ধনিকগণ হিটলারকে অর্থসাহায্য করেছিল এরূপও অনেকের বিশ্বাস। হিটলার ক্ষমতা হাতে পেয়ে ছলে বলে এ দলগুলির কণ্ঠরোধ করলেন। ওয়াইমার শাসনতন্ত্র অনুসারে জার্ম্মানীতে পার্লামেণ্টারী শাসন প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। নির্ব্বাচিত সদস্যের ভিতর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রীসভা গঠন করত, সরকার-বিরোধী দলগুলিও সেখানে থাকত। সমস্ত আইনকানুনও অধিকাংশের ভোটেই পাস করিয়ে নেওয়া হ'ত। হিটলার কিন্তু পার্লামেণ্টের দ্বারা একটি আইন পাস করিয়ে এর সমস্ত ক্ষমতাই লোপ করে দিলেন! এর পর রাইখ্‌ষ্টাগ একটা বিতর্ক সভায় পর্য্যবসিত হয়। সমস্ত মন্ত্রীরাই আইনকানুন জারি করতে পারেন। প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যুর পর হিটলার হলেন জার্ম্মানীর সর্ব্বময় কর্ত্তা। শাসন-বিভাগ, দেশরক্ষা-বিভাগ, পররাষ্ট্র-বিভাগ সব বিভাগেই মন্ত্রীরা রয়েছেন, তবে তাঁর কথামতই এদের চল্‌তে হয়। তিনি জার্ম্মান রাষ্ট্র-বাহিনীগুলির একমাত্র অধ্যক্ষ।

হিটলার বললেন, জার্ম্মানজাতি প্রাচীন আর্য্যদের বংশধর। জাতির বিশুদ্ধতার অপহ্নব ঘটেছে ইহুদীদের সংস্রবে এসে। কাজেই ইহুদী-দলন জার্ম্মানীতে প্রচণ্ড আকার ধারণ করল। গত ১৯৩৮ সালের নবেম্বর-ডিসেম্বরে এ অত্যাচার এতই চরমে উঠে যে, বিশ্ববাসী তো বিস্ময় মানলেই, অনেক হিটলার-পন্থী জার্ম্মানও নাকি এতে দুঃখিত না হয়ে পারে নি। ভের্সাই সন্ধিতে জাতির পুনর্গঠনের পক্ষে যে-সব প্রাথমিক বাধা সৃষ্ট হয়েছিল, হিটলার তা একে একে দূর করে দিলেন। ভের্সাই সন্ধিতে ঠিক হয়েছিল জার্ম্মানী এক লক্ষের উপর সৈন্য রাখ্‌তে পারবে না। নৌবাহিনী তাকে সামান্যই রাখ্‌তে দেওয়া হয়েছিল। বিমান-বাহিনী একেবারেই নষ্ট করে দেওয়া হয়! তবে এ সময় এ রকম একটি প্রস্তাবও বিধিবদ্ধ হয় যে, অন্য রাষ্ট্রগুলিকেও আস্তে আস্তে দেশরক্ষা-বাহিনী হ্রাস করতে হবে। ঐ সব রাষ্ট্র এ কথা মোটেই মানে নি। বরং ফ্রান্স প্রভৃতি অনেকে এগুলি খুবই বাড়িয়ে চলেছিল। হিটলার প্রস্তাব করলেন, হয় সকলকেই সৈন্যসামন্ত কমাতে হবে, না হয় জার্ম্মানীর রণশক্তি বাড়াবার ক্ষমতাও তাদের স্বীকার করে নিতে হবে। রাষ্ট্র-সংঘে এ দাবি পেশ করা হ'ল, কিন্তু বিজয়ী রাষ্ট্রগুলি হিটলারের কথায় কর্ণপাত করলে না।

জার্ম্মানী অবিলম্বে রাষ্ট্র-সংঘ ত্যাগ করলে। হিটলার স্বদেশবাসীকে বাধ্যতামূলক যুদ্ধ শিক্ষা দিতে সুরু করলেন।

এযাবৎ ব্যোমবাহিনী গঠন নিষিদ্ধ হলেও জার্ম্মানীতে বিমান-পোতের মোটেই অভাব ছিল না। এগুলিকে যুদ্ধোপযোগী করে তৈরী করা হয়েছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই তাই একটি ব্যোমবাহিনীও জার্ম্মানীতে দেখা দিল। এখন বিমানপোতে জার্ম্মানী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। মাসে সে নাকি হাজার-খানা বিমানপোত তৈরী করতে পারে! গত ১৯৩৫ সালে ইংরেজের সঙ্গে নৌ-চুক্তি করে নৌবহর পুনর্গঠনেরও ব্যবস্থা করে নেয় সে। এই চুক্তিতে অনুপাত ঠিক হয়েছিল ১০০%৩৫ অর্থাৎ ব্রিটেনের যদি থাকে একশ' খানা জাহাজ, জার্ম্মানীর থাকবে পঁয়ত্রিশখানা। সাব্‌মেরিন সম্বন্ধে কিন্তু শর্ত্ত করা হয় যে, প্রয়োজন হ'লে ইংলণ্ডের সমান করে সে সাব্‌মেরিন তৈরী করতে পারবে। সে তার সমান করেই যে সাব্‌মেরিন তৈরী করবে এ কথা পরে তাকে জানিয়ে দেয়।

হিটলার তাঁর আত্মজীবনীতে স্পষ্ট করে বলেছেন—তিনি পশ্চিম ইউরোপে কোন রাজ্য চান না, মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপে যদি তাঁর কর্ত্তৃত্ব স্বীকৃত হয় তা হলেই তিনি সন্তুষ্ট থাক্‌বেন। মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্স মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে জার্ম্মানীকে ঠেকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। ইটালী ফ্রান্সের প্রভাবে ঈর্ষান্বিত হলেও সে-ও চায় নি যে, ওখানে জার্ম্মানীর ক্ষমতা বেড়ে যায়। অষ্ট্রিয়া নিয়ে জার্ম্মানীর সঙ্গে ইটালীর বিরোধ ছিল খুবই। ইটালী

প্রসঙ্গে এ কথা তোমাদের বলেছি। জার্ম্মানীর উপর ব্রিটেনের মনোভাব কিন্তু খুবই বদলে গেল। হিটলারের উদ্দেশ্য তাঁর বইয়ে যেরূপ প্রকাশ পেয়েছে তাতে ব্রিটেনের মনোভাব বদ্‌লে যাবারই কথা। জার্ম্মানী বড় হলে তার তো আর কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হচ্ছে না! হিটলার তো আর তাদের সাম্রাজ্য চাইছেন না। রাষ্ট্রসংঘ ত্যাগ ক'রে ও যদৃচ্ছ সৈন্য সংখ্যা ও রণসম্ভার বৃদ্ধি ক'রে তিনি একে একে যখন ভের্সাই সন্ধির শর্ত্তগুলি ভেঙে দিচ্ছিলেন ঠিক সেই সময়ে ইংরেজ তাঁর সঙ্গে নৌ-চুক্তি করে বস্‌ল! হিটলারের বইয়ে আর একটি কথা আছে—সমগ্র জার্ম্মান জাতিকে এক করতে হবে। 'বেশ কথা, এক করলে তাতে আমার ক্ষতি কি?'—ইংরেজ এই ভাব্‌লে। সার প্রদেশে গণভোট নেওয়া হ'ল, প্রায় সকলেই জার্ম্মানীর সঙ্গে যুক্ত হতে চাইল। সার প্রদেশ অগত্যা জার্ম্মানীকে দেওয়া হ'ল। অন্যান্য দেশের জার্ম্মানদের ভিতরও এক হবার বাসনা জাগে এ সময় থেকে। মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপে ছোট রাষ্ট্রগুলিতেও ব্যবসার ছলে ধীরে ধীরে এ ভাব প্রবেশ করতে সুরু করল।

এই সময় আর একটি ঘটনা ঘটে যাতে ইউরোপের রাজনীতির গতি একেবারে ফিরে যায়। ইটালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করলে। রাষ্ট্র-সংঘ তাকে বাধা দেবার জন্য যে-সব চেষ্টা করেছিল, আগে তা তোমাদের বলেছি। ইচ্ছায় হোক

অনিচ্ছায় হোক, ইংরেজ ও ফরাসীই এতে বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়ল ও ইটালীর বিরুদ্ধে দাঁড়াল। জার্ম্মানী রাষ্ট্রসংঘের সভ্য নয়। সে ভাবলে—ইটালীকে হাতে করবার এই সুবিধা। সুতরাং যখন দেখ্‌লে যে, ইটালী রাষ্ট্রসংঘ তথা বড় শক্তিগুলিকেও অগ্রাহ্য করে আবিসিনিয়া জয়ে উদ্যত, সেই সুযোগে হিটলার রাইনল্যাণ্ড পুনরায় অধিকার করলেন। রাইনল্যাণ্ড জার্ম্মানীরই একটি অংশ। কিন্তু ফ্রান্সের সুবিধার জন্য এবং ভের্সাই সন্ধি ও পরে লোকার্নো চুক্তি অনুসারে একে নিরস্ত্রীকৃত করে রাখা হয়েছিল। ফরাসী সীমা হ'তে এ অঞ্চলে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে কোন রকম দুর্গ বা ঘাঁটি নির্ম্মাণ করে জার্ম্মানী আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারত না। রাইনল্যাণ্ড অধিকার কালে কেউ বিশেষ উচ্চবাচ্য করে নি, কিন্তু সকলেই বুঝতে পেরেছিল জার্ম্মানীর শক্তি কিরূপ দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। ঐ বছরই মে মাসে ইটালী আবিসিনিয়া জয় করে। পরবর্ত্তী জুলাইয়ে হিটলার মুসোলিনীর আবিসিনিয়া জয় স্বীকার ক'রে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন। তাঁর সঙ্গে অষ্ট্রিয়া সম্পর্কে একটা আপোষ-রফাও করে নিলেন।

এর পরে সপ্তাহখানেক যেতে না যেতেই স্পেনে বিদ্রোহ সুরু হ'ল। অমনি হিটলার ও মুসোলিনী বিদ্রোহী দলকে সাহায্য করতে ছুটলেন! অনেকে বলেন, এ দুজনের উস্কানিতেই জেনারেল ফ্রাঙ্কো অত শীঘ্র স্পেন-সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে

সাহসী হয়। ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করার মূলে উভয়েরই কতকটা গূঢ় ও ব্যাপক উদ্দেশ্য ছিল। হিটলার মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপে এবং মুসোলিনী দক্ষিণ ইউরোপে নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তার করতে পারলে ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার কথা। এজন্য পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতেও অঙ্গীকার করে প্রথম থেকে। ঐ সালের ডিসেম্বর মাসে জার্ম্মানী ও তার কিছু পরেই ইটালীও জাপানের সঙ্গে একটী গুরুতর চুক্তিতে আবদ্ধ হ'ল। তখন হিটলার ও মুসোলিনী নানাভাবে আটঘাট বেঁধে নূতন রাজ্যই যে দাবি করবেন এতে আর সন্দেহ রইল না। জার্ম্মানরা আর মন্ত্রগুপ্তি বজায় রাখতে পারলে না। তারা সমস্বরে হৃত উপনিবেশগুলি চেয়ে বস্‌ল। তোমরা জেনেছ ইংরেজের অধীনেই এর বেশীর ভাগ রয়েছে। তারা কিন্তু এসব হাত ছাড়া করতে রাজি নয়। বস্তুতঃ এই সময় থেকেই ইংরেজের টনক নড়তে আরম্ভ হয়।

পরবর্ত্তী ক' বছরে আরও এমন কতকগুলি ব্যাপার ঘটে যেজন্য ইউরোপবাসী সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। ইউরোপ ছাপিয়ে তার ঢেউ অন্যত্রও গিয়ে পৌঁছয়। জার্ম্মানীর অস্ত্রশস্ত্র দিন দিন হুহু করে বেড়ে যেতে লাগল। সেখানে 'মাখনের চেয়ে বন্দুক উৎকৃষ্টতর' এই নীতি অহরহ প্রচারিত হ'ল। একটি চতুর্বার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী জাতির সর্ব্বশক্তি রণসম্ভার নির্ম্মাণে নিয়োজিত হয়। হিটলার গায়ের জোরেই যেন

বাজি মাৎ করতে চাইলেন। মুসোলিনীর সঙ্গে তাঁর আঁতাত পাকা। উভয়ে উভয়ের দেশ পরিদর্শন করেন, সামরিক আয়োজনও উভয়ের পরামর্শ মতই করা হয়। যে অষ্ট্রিয়া নিয়ে এতকাল ইটালী ও জার্ম্মানীর ভিতর বিরোধ চলেছিল সেই অষ্ট্রিয়াকে একে অন্যের সম্মতি নিয়েই দখল করলে। হিটলার অষ্ট্রিয়ারও মালিক হলেন। তাঁর নীতিই হ'ল সব জার্ম্মানকে এক রাষ্ট্রভুক্ত করা। এতকাল তিনি তার উদ্দেশ্য সাধনে কারো সাহায্য বা সমর্থন পান নি, এবার মুসোলিনী তাঁর পক্ষে আসায় তাঁর আর কোন চিন্তাই রইল না। প্রতিবেশী দেশগুলি কিন্তু প্রমাদ গণলে,—বিশেষ করে তাঁরা যখন দেখ্‌লে অষ্ট্রিয়া গ্রাস করবার সময় ফ্রান্স ব্রিটেন কেউই টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করলে না। জার্ম্মানীর চারদিকে সব দেশেই তো জার্ম্মান কিছু কিছু রয়েছে! এ ভাবে সকলকে এক করতে পারলে তাদের অনেকেরই যে অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে!

প্রতিবেশী রাজ্যগুলির ঐ আশঙ্কা যে মোটেই অমূলক নয় অষ্ট্রিয়া-গ্রাসের দু' এক মাসের ভিতরই তা বেশ বুঝা গেল! চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেনে জার্ম্মানরা এতদিন শুধু স্বায়ত্ত-শাসন চেয়েছিল। হিটলারের অষ্ট্রিয়া অধিকারের পর তাদের দাবি আরও বেড়ে গেল। হিটলার কিছুকাল টালমাটাল করবার পর এ অঞ্চলকে জার্ম্মানীভুক্ত করাই সাব্যস্ত করলেন, আর এজন্যে চেকোশ্লোভাকিয়াকে চরম পত্রও দিলেন,—১৯৩৮ সালের

সেপ্টেম্বর মাসে। সমস্ত ইউরোপ যেন কেঁপে উঠ্‌ল। যুদ্ধ বাধে আর কি! চেকোশ্লোভাকিয়ার উৎপত্তি হয় ভের্সাই সন্ধির ফলে। ইংরেজ, ফরাসী এজন্য একে রক্ষা করতে বাধ্য। তার উপরে ফ্রান্স ও সোভিয়েট রুশিয়া এর সঙ্গে পারস্পরিক আত্মরক্ষামূলক চুক্তিতেও তখন আবদ্ধ ছিল। তাই লোকে ভাবল বুঝি-বা যুদ্ধ বাধে। কিন্তু যুদ্ধ বাধ্‌ল না। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন হিটলারের সঙ্গে ছু-বার দেখা করে তাঁর ক্ষুধা মেটাবার আয়োজন করলেন। ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্ম্মানী ও ইটালীর রাষ্ট্রনায়কেরা মিউনিক শহরে মিলিত হয়ে হিটলারের দাবি পূরণ করলেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার যে-যে অঞ্চলে জার্ম্মানদের বাস সে সকলই হিটলারকে দিয়ে দেওয়া হ'ল। এর ফলে চেকোশ্লোভাকিয়া সামান্য অংশ মাত্র হারাল বটে, কিন্তু দুর্গ-প্রাকার দ্বারা সুরক্ষিত সীমানা হারিয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে হিটলারের আয়ত্তের মধ্যেই এসে গেল।

মিউনিক চুক্তি নিষ্পন্ন হবার পর ছ' মাস যেতে না যেতেই জার্ম্মানী আবার মার মূর্ত্তি ধারণ করলে। ইহুদী দলন ও উপনিবেশের দাবি তো সমানভাবে চল্‌লই, উপরন্তু চেকোশ্লোভাকিয়াকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেবারও ব্যবস্থা করা হ'ল। শ্লোভাকিয়া ও রুথেনিয়াকে আলাদা করে দিয়ে অবশিষ্ট বোহিমিয়া ও মোরাভিয়া হিটলার গ্রাস করে ফেল্‌লেন। শ্লোভাকিয়া নামে মাত্র স্বায়ত্ত-শাসন পেলে। রুথেনিয়া দিয়ে দেওয়া হ'ল

হাঙ্গেরিকে! জার্ম্মানী এ সময় মেমেলও নিয়ে নেয়, তবে এ নিয়ে তেমন উচ্চবাচ্য হয় নি। এর পর থেকেই ইউরোপের অবস্থা আবার জটিল হয়ে উঠল।

ক্রমে পোল্যাণ্ডের উপরও জার্ম্মানীর নজর পড়ল। পোল্যাণ্ডের ডানজিগ তার চাই। জার্ম্মানীকে কিরূপে বাগ মানানো যাবে এই চিন্তা হ'ল ব্রিটেন ও ফ্রান্সের। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের আগেই সন্ধি ছিল। ব্রিটেন তার সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্যমূলক চুক্তি করে নিল। পোল্যাণ্ডের গায়ে কেউ আঁচড় কাটতে চাইলে ব্রিটেন ফ্রান্স একযোগে যুদ্ধে পর্য্যন্ত নাম্‌বে স্থির হ'ল। রুশিয়ার সঙ্গেও এরা একটা চুক্তি করতে চাইলে। কয়েক মাস আলাপ আলোচনাও চল্‌ল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত চুক্তি হ'ল না। ১৯৩৯ সালের ২৩শে আগষ্ট তারিখে লোকচক্ষুর অগোচরে সোভিয়েট রুশিয়া ও জার্ম্মানীর মধ্যেই একটা অনাক্রমণাত্মক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেল! এ কিন্তু কম আশ্চর্য্যের কথা নয়। এর পর আট দিনের ভিতরই যুদ্ধ সুরু হয়ে গেল।

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জার্ম্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে। পনর দিনের ভিতরই ইউরোপের মানচিত্র থেকে পোল্যাণ্ডের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হ'ল। জার্ম্মানীর এ কার্য্যে সহায় হ'ল সাম্যবাদী সোভিয়েট রুশিয়া! ব্রেষ্ট-লিটভ্‌স্ক শহরে বসে জার্ম্মানী ও রুশিয়া পোল্যাণ্ড বখ্‌রা করে নিলে। ফ্রান্স ও ব্রিটেন প্রত্যক্ষ ভাবে পোল্যাণ্ডকে সাহায্য করলে না, তারা

জার্ম্মানীকে আক্রমণ করলে তার পশ্চিম সীমা থেকে। জার্ম্মানী 'ইউ-বোট' হতে টর্পেডো ছেড়ে ও ম্যাগ্নেটিক মাইন নামে মাইন পুতে বিস্তর ব্রিটিশ জাহাজ ডুবিয়ে দিল। অন্যদের জাহাজও ডুবিয়েছে অনেক। সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে জার্ম্মানী এ সময় আর্থিক চুক্তিও করে নেয়। সোভিয়েট রুশিয়া বল্টিক রাষ্ট্রগুলির উপর চড়াও হ'ল ও ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ করলে। ওঅঞ্চলে আগে জার্ম্মানীর প্রভাব ছিল। রুশ-জার্ম্মান চুক্তির পর এখান থেকে সে হাত গুটিয়ে নেয়।

তবে হিটলারও কিন্তু বেশী দিন বসে রইলেন না। তিনি ১৯৪০ সালের এপ্রিল ও মে মাসের মধ্যে সৈন্য-বাহিনী প্রেরণ ক'রে প্রতিবেশী রাজ্যগুলি আক্রমণ করলেন। নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, লাক্সেমবার্গ একে একে জার্ম্মানীর পদানত হ'ল। মিত্রশক্তি বাহিনী জার্ম্মানদের প্রত্যেক জায়গাতেই বাধা দিলে বটে, কিন্তু তাতে বিশেষ কোন ফল হয় নি,—প্রত্যেক জায়গা থেকেই তাদের হটে আসতে হ'ল। এ সময়ের ভিতরই আরম্ভ হ'ল ফ্রান্স অভিযান। ফরাসীরা শ্রেষ্ঠতর জার্ম্মান রণশক্তির সম্মুখে দাঁড়াতেই পারলে না। রাজধানী প্যারিসকে 'খোলা শহর' ঘোষণা করে সরকার অন্যত্র চলে গেলেন। জার্ম্মান-বাহিনী প্যারিসে বিজয়-পতাকা ওড়াল। এর পরে ২২শে জুন বন্ধু ব্রিটেনকে কোনরকম জিজ্ঞাসাবাদ না করেই মার্শাল পেঁতার নেতৃত্বে ফ্রান্স এককভাবে জার্ম্মানীর সঙ্গে

সন্ধি করে ফেলে! ফ্রান্সের প্রায় অর্দ্ধেকটা তখন জার্ম্মানদের অধিকারে আসে।

ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের লণ্ডন ও পূর্ব্ব-দক্ষিণ তীরবর্ত্তী শহর-গুলির উপরে জার্ম্মান বিমান-বাহিনী সমানে বোমাবর্ষণ করতে থাকে। একদিকে ইউবোটের আক্রমণে যেমন বিস্তর জাহাজ-ডুবি হয়ে ব্রিটেন ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল অপর দিকে তেমনি বিমান আক্রমণে তার বহু অমূল্য সম্পদ ও শত শত নর-নারী বিনষ্ট হতে লাগ্‌ল।

ফ্রান্সের পতনের পর জার্ম্মানী মধ্য ও পূর্ব্ব-দক্ষিণ ইউরোপে বিশেষভাবে নজর দিতে থাকে। শ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়া জার্ম্মানীর অক্ষ-ভুক্ত হয়। তুরস্ক বাদে বলকান উপদ্বীপে অবশিষ্ট রইল যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীস। এ দুটি রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় জার্ম্মানীর তাঁবেদার হতে রাজি না হওয়ায় গত ১৯৪১, এপ্রিল মাসে হিটলার এখানে অভিযান চালান ও তাতে অতি দ্রুত জয়লাভ করেন। আক্রান্তদের সাহায্যকারী ব্রিটিশ-বাহিনীকে ওসব অঞ্চল ছেড়ে অতি সত্বর চলে আস্‌তে হয়।

সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে জার্ম্মানীর মিত্রতা আর বেশীদিন টিক্‌ল না। ১৯৪১ সালের ২২শে জুন হিটলার রুশিয়া আক্রমণ করে বস্‌লেন। এ অভিযান চল্‌ল আঠার শ' মাইল ব্যাপী। পৃথিবীর ইতিহাসে একই সময়ে এতখানি ভূখণ্ড জুড়ে যুদ্ধ আর কখনও হয় নি। সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষ নিলে ব্রিটেন।

যুদ্ধারম্ভের প্রথম চার মাসে জার্ম্মান-বাহিনী বিস্তর জায়গা দখল করে। রুশিয়ার কোষাগার শস্যশ্যামল ইউক্রেন জার্ম্মানদের অধীন হ'ল। কিন্তু এর পরেই এল শীত। শীতের সুযোগ নিয়ে সোভিয়েট-বাহিনী জার্ম্মানদের হটিয়ে দিতে কতকটা সমর্থ হয়। কিন্তু শীত অন্তে ১৯৪২ সালের গ্রীষ্ম ও বর্ষায় আবার জার্ম্মান-বাহিনী সোভিয়েট রুশিয়ার দিকে ধাওয়া করে। এবার তাদের লক্ষ্য মস্কো নয়, তারা একেবারে তৈলের আকরভূমি ককেশসের দিকে ধাবমান হ'ল। এই তৈল-রাজ্য নিতে পারলে জগতে কেউ আর জার্ম্মানদের রুখ্‌তে পারবে না— তারা হয়ত তখন এইরূপ মনে করেছিল। তারা ককেশসের মধ্যে গিয়ে পৌঁছেছিল।

ইটালীর প্রসঙ্গে অক্ষ-বাহিনীর উত্তর-আফ্রিকা অভিযান পরিত্যাগ এবং খাস ইটালীতে অক্ষ-বাহিনী ও মিত্রশক্তি-বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষের কথা তোমাদের বলেছি। ইটালীতে পরে উভয় পক্ষে ঘোর সংগ্রাম চলে। বলা বাহুল্য, অক্ষ-বাহিনী বল্‌তে তখন থেকে বেশীর ভাগ জার্ম্মান সেনাদলই বুঝতে হবে। মিত্রশক্তির নিকট ইটালীর আত্মসমর্পণের পর হিটলার এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, মুসোলিনী তাঁর প্রকৃত বন্ধু, তাঁকে তিনি কোন মতেই পরিত্যাগ করতে পারবেন না। মুসোলিনীকে ইটালীর কারাগার থেকে উদ্ধার করে তিনি তাঁর কথাই হয়ত পালন করেছিলেন।

এর পর থেকে জার্ম্মান-বাহিনীকে রুশিয়ার রণক্ষেত্র থেকেও হাত গুটিয়ে নিতে হয়। রুশিয়ার অভ্যন্তরে তারা বহু দূর দূর অঞ্চল অধিকার করেছিল। পরে কিন্তু তাদের সেই সব স্থল ত্যাগ করে ক্রমশঃ পশ্চাতেই হটে আস্‌তে হয়। এ তাদের শক্তিহীনতার লক্ষণ, না যুদ্ধের কৌশল পরিবর্ত্তন, তখন পর্য্যন্ত বিশেষ কিছুই বুঝা যায়নি। তবে মিত্রপক্ষ পূর্ব্বাপেক্ষা ঐ সময় অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করে। তাঁরা ইতি-মধ্যে জার্ম্মান অধিকৃত ফ্রান্সের একটি স্থলে অতর্কিতে আক্রমণ করে বুঝেছিলেন যে, হিটলার ও অঞ্চল বেশ সুরক্ষিত করে নিয়েছেন। এর পরে তাঁরা বলকান অঞ্চল থেকে আক্রমণ চালাবার সুযোগ খুঁজতে লাগ্‌লেন। কিন্তু উত্তর আফ্রিকায় নিষ্কণ্টক হয়ে ইটালীর মধ্য থেকেই অক্ষবাহিনীকে আক্রমণ করতে আরম্ভ করে। বার্লিনে ও অন্যান্য রণাস্ত্র-নির্ম্মাণ কারখানায় মিত্রপক্ষ কিছুদিন যাবৎ বোমাবর্ষণ করে ভীষণ ক্ষতি-সাধন করে।

এশিয়ায় জাপানের অতর্কিত আক্রমণে মিত্রপক্ষ ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় বটে, কিন্তু তারা প্রথমেই জাপানের বন্ধু জার্ম্মানী তথা ইটালীকে ঘায়েল করতে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েছিল। ইটালীতে অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হওয়ায় এবং সে-দেশ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হওয়ায় বেশ কাবু হয়ে পড়ে। জার্ম্মানীকে উদ্ব্যস্ত করে তোলার জন্যই এই কৌশল অবলম্বিত হয় নিশ্চিত।

জগৎ কোন্ পথে

গত এক বৎসরের মধ্যে এমন অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে যা কেউ কখনো ভাবতেও পারে নি। তেহেরানে মিত্রপক্ষীয় চার্চ্চিল রুজভেল্ট ও ষ্টালিনের মধ্যে সলাপরামর্শ হয়ে যাবার পর জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির আক্রমণ প্রবলাকার ধারণ করে। ক্রমে জার্ম্মানীর শক্তি মন্দিভূত হয়ে পড়ে। পূর্ব্ব থেকে সোভিয়েট রুশিয়া জার্ম্মানীকে হটিয়ে দিতে দিতে পোল্যাণ্ডের ভিতরে প্রবেশ করে। পশ্চিম দিক থেকে ব্রিটিশ ও মার্কিন বাহিনী ফ্রান্সের ভিতর দিয়ে জার্ম্মানীর দিকে প্রধাবিত হয়। বলা বাহুল্য ফ্রান্স অতি শীঘ্রই জার্ম্মানীর কবল থেকে মুক্তিলাভ করলে। জার্ম্মানী সব সৈন্য নিজ সীমান্তে নিয়ে গেল ও আত্মরক্ষায় অভিনিবিষ্ট হল। ক্রমে পূর্ব্ব থেকে সোভিয়েট বাহিনী এবং পশ্চিম থেকে ব্রিটিশ ও মার্কিন বাহিনী জার্ম্মানীর মধ্যে প্রবেশ করলে। সোভিয়েট বাহিনী বার্লিন পর্য্যন্ত অধিকার করে ফেলে। জার্ম্মান শক্তি প্রতিটি ক্ষেত্রেই মিত্রশক্তি বাহিনীকে প্রাণপণে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু কিছুতে কিছু হ'ল না— জার্ম্মানীর পতন হ'ল অনিবার্য্য। হিটলার এ আঘাত সহ্য করতে না পেরে আকস্মিক ভাবেই দেহত্যাগ করেন। এর পর তাঁর সহচর অনুচরদের মধ্যে অনেকেই আত্মহত্যা করে নিজেদের সম্মান বাঁচালেন। গোয়েরিং ধরা পড়লেন। প্রধান-প্রধান সেনানায়কেরা লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়ে বন্দী হলেন।

বর্ত্তমান ১৯৪৫ সালের মধ্যভাগে ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও

জার্ম্মানী

সোভিয়েট রুশিয়া—এই ত্রিশক্তির কর্ণধারগণ বার্লিনের পট্স্‌ডামে বসে বিজিত জার্ম্মানীর অদৃষ্টলিপি নির্ম্মাণে ব্যাপৃত হন। ২রা আগষ্ট তারিখে লণ্ডন, ওয়াশিংটন, মস্কো ও বার্লিন থেকে যুগপৎ এই অদৃষ্টলিপি অর্থাৎ জার্ম্মানী সম্পর্কে ত্রিশক্তির সম্মিলিত কার্য্যপ্রণালী এবং আরও অনেক কথা সাত হাজার শব্দের একটি ঘোষণায় প্রকাশিত হয়েছে। এবারকার যুদ্ধের তীব্রতা ও বিভৎসতা অভূতপূর্ব্ব, কাজেই বিজিত জার্ম্মানী সম্পর্কে কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বিত হবারই আয়োজন হয়েছে। জার্ম্মানীতে শাসনকর্ত্তা আর একজন থাক্‌বে না। মার্কিন, ব্রিটিশ, রুশ ও ফরাসী বাহিনীর প্রধান সেনাপতিগণ নিজ নিজ অধিকৃত অঞ্চলে স্বতন্ত্রভাবে শাসন করবেন। তবে সকলের উপরে এঁদের একটি যুক্ত-পরিষদ থাক্‌বে। জার্ম্মানী হতে জঙ্গীবাদের উচ্ছেদ কল্লে জার্ম্মান জাতিকে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্র করা হবে। জার্ম্মান জল, স্থল ও বিমান বাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করে তবে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা সম্ভব। জার্ম্মানীর সমুদয় সামরিক ও বেসামরিক প্রতিষ্ঠান, ক্লাব ও সমিতি—যে-সব জার্ম্মানীর সামরিক শক্তি জীইয়ে রাখতে সহায়তা করে, সবই নির্মূল করে দেওয়া হবে। জার্ম্মানীর সমরোপকরণ নির্ম্মাণ এবং সকল প্রকার বিমান ও সমুদ্রগামী জাহাজ নির্ম্মাণ কেন্দ্র বন্ধ করতে হবে। ধাতু, রাসায়নিক দ্রব্য, যন্ত্রপাতি প্রভৃতিও কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হবে। সমগ্র জার্ম্মানী যতদিন

মিত্রশক্তিগণের অধিকারে থাক্‌বে ততদিন সেখানকার খনি, শিল্পোৎপাদন, কৃষি, বন, মৎস্যের ব্যবসায়, মজুরী, দ্রব্য মূল্য, রেশনিং, আমদানী, রপ্তানি, মুদ্রা, ব্যাঙ্কিং, কর ধার্য্য করণ, বাণিজ্য-শুল্ক, ক্ষতিপূরণ, যানবাহন সবই, জার্ম্মানী চারিভাগে বিভক্ত হলেও, একই নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হবে। জার্ম্মানীর নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের বিশেষ ব্যবস্থা করা হবে। ঘোষণায় এই মর্ম্মে বলা হয়েছে যে, সমগ্র জার্ম্মান জাতির সামরিক মনোবৃত্তি যাতে বদলে যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই সব কাজ করা হবে। নাৎসি আইন-কানুন, শিক্ষা ব্যবস্থা, শিল্প-নিয়ন্ত্রণ, শাসন-ব্যবস্থা সব তুলে দিয়ে যাতে জার্ম্মানগণ গণতন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয় সে চেষ্টাই করা হবে। জার্ম্মান জাতিকে কৃষি ও ছোট ছোট শিল্প কর্ম্মে নিয়োজিত রাখ্‌তে হবে। পট্‌স্‌ডামে জার্ম্মান জাতি সম্পর্কে যে-সব ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে বলে ধার্য্য হয়েছে তার আভাস মাত্র এখানে দেওয়া হ'ল। জনৈক বিশেষজ্ঞ বলেছেন এর সঙ্গে তুলনা করলে ভের্সাই সন্ধি নিতান্তই ছেলেখেলা বলেই মনে হল।

—চার—

বৃহত্তর জার্ম্মানী

যা হোক, জার্ম্মানী দ্বিতীয় মহাসমর আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে কিরূপ শক্তিমান হয়ে উঠেছিল সে কথাও তোমাদের একটু বলতে হবে। বিগত প্রথম মহাসমরে প্রেসিডেণ্ট উইলসন যে চৌদ্দ দফা শর্ত্ত দিয়েছিলেন তার একটি ছিল—এক একটি জাতিকে এক একটি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা। কিন্তু অন্যান্য বিজয়ী শক্তির চক্রান্তে এ সব শর্ত্ত অনুযায়ী কাজ হয় নি। ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রমুখ মিত্রশক্তিদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, জার্ম্মানী ও হাঙ্গেরীর শক্তিকে এমনভাবে খণ্ডিত করে দেওয়া যাতে তারা ভবিষ্যতে আর মাথা তুলতে না পারে। জার্ম্মানী থেকে এমন অনেক অংশ বিচ্ছিন্ন করা হ'ল যে-সব স্থলে ছিল একমাত্র জার্ম্মানদেরই বাস। অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ভেঙে যে সকল রাষ্ট্র গঠিত হয় তাতেও বিস্তর জার্ম্মান বাস করত। এই সকল জার্ম্মান অধ্যুষিত অঞ্চল এক করে দিলে, খর্ব্ব বা দুর্ব্বল হওয়া দূরে থাকুক, জার্ম্মানীর শক্তি আগের চেয়ে শত গুণে বেড়ে যাবে,—বিজয়ী শক্তিদের এ মোটেই কাম্য ছিল না। নূতন রাষ্ট্র গঠন কালে তারা বিশেষ করে নজর রেখেছিল জার্ম্মানী ও হাঙ্গেরীর শক্তি খর্ব্ব করার দিকে।

পোল্যাণ্ডের উল্লেখ আগে করেছি। পোল্যাণ্ড এক সময়ে স্বাধীন রাজ্য ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রুশিয়া (বর্ত্তমান জার্ম্মানীর নেতৃস্থানীয়), অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও রুশিয়া ষড়যন্ত্র করে নিজেদের মধ্যে একে ভাগ করে নেয়। যুদ্ধের সময় তার আবার স্বাধীনতা লাভের সুযোগ ঘটে। মাসারিক যেমন মিত্রশক্তিদের সাহায্য করে চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা লাভ সম্ভব করে দেন, পোল্যাণ্ডেও পিলস্যুড্‌স্‌কি জার্ম্মান পক্ষে যোগ দিয়ে এর স্বাধীনতা সম্ভব করে তোলেন। যুদ্ধ শেষে ভের্সাই সন্ধিতে পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা ঘোষিত হ'ল। কিন্তু শুধু পোল জাতিকে নিয়ে পোল্যাণ্ড গঠিত হ'ল না। পোল ছাড়া জার্ম্মান, ইউক্রেন, রুশ প্রভৃতি জাতির বহু লোকও এখানে রয়ে গেল! পূর্ব্বের চেয়ে এবারকার পোল্যাণ্ডের আয়তনও বেড়ে যায়। দ্বিতীয় মহাসমরে পোল্যাণ্ডের আবার ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে। এবারে জার্ম্মানী ও রুশিয়া নিজেদের মধ্যে একে ভাগাভাগি করে নেয়। সম্প্রতি পোল্যাণ্ড আবার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ভেঙে গড়া হ'ল অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া। অষ্ট্রিয়ার টাইরল জুড়ে দেওয়া হ'ল ইটালীর সঙ্গে। উইলসনের শর্ত্ত কিরূপ পুরাপুরি ভঙ্গ করা হ'ল তাও একবার দেখ। অষ্ট্রিয়ায় এক কোটি জার্ম্মানের বাস। তাদের নিয়ে করা হ'ল আলাদা

একটা রাষ্ট্র। টাইরলে আড়াই লক্ষ জার্ম্মান ছিল। এ অংশ ইটালী পেল। হাঙ্গেরীর উপরে মিত্রশক্তিদের ক্রোধ খুব। এখানকার শাসকজাতির নাম মেগিয়ার। এই মেগিয়াররা যাতে জোট বাঁধতে না পারে তার ব্যবস্থা করা হ'ল। মেগিয়ারদের অধিকাংশই হাঙ্গেরীতে রয়ে গেল বটে, কিন্তু অনেককে চেকোশ্লোভাকিয়া ও রুমানিয়ার মধ্যেই পুরে দেওয়া হ'ল। চেকোশ্লোভাকিয়ার ভিতরে হ'ল বহু জাতির সমাবেশ। চেক, শ্লোভাক, জার্ম্মান, মেগিয়ার, ইউক্রেন ও পোল—এই সব জাতি নিয়ে গঠিত হ'ল চেকোশ্লোভাকিয়া রাষ্ট্র! মিত্রশক্তিরা ভেবেছিল মধ্য ইউরোপে এদের দিয়ে একটি প্রবল রাষ্ট্রের সৃষ্টি করতে পারলে জার্ম্মানী বা হাঙ্গেরী আর মাথা তুলতে পারবে না। বিশ বছর পরে কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়াকে জার্ম্মানী, হাঙ্গেরী ও পোল্যাণ্ড টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে নিয়েছিল। যুগোশ্লাভিয়া গঠিত হ'ল সার্ভ, ক্রোট ও শ্লোভেনদের নিয়ে। এখানেও এই তিন জাতির দ্বন্দ্ব লেগেই ছিল। রুমানিয়ার অস্তিত্ব আগেও ছিল, কিন্তু যুদ্ধের পরে তার আয়তন প্রায় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়। পূর্ব্ব ইউরোপে রয়েছে বুলগেরিয়া গ্রীস ও তুরস্ক। তুরস্কের কথা তোমাদের আগেই বলেছি। গ্রীস ও বুলগেরিয়া তখন মিত্রশক্তিদের চক্রে পড়ে নি বলে তাদের সীমানার বিশেষ কোন রদবদলও হয় নি।

কি উদ্দেশ্যে, মধ্য ইউরোপকে এরূপ অস্বাভাবিক ভাবে

বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভাগ করা হয়েছিল তা এইমাত্র তোমাদের বল্‌লাম। যুদ্ধের পর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপ থেকে সরে দাঁড়াল। মধ্য ইউরোপে বিশেষ কোন স্বার্থ না থাকায় সেখান থেকে ব্রিটেনও আস্তে আস্তে হাত গুটায়। এখন রইল ফ্রান্স ও ইটালী। যুদ্ধ-ক্ষত সারতেই ইটালী ব্যস্ত, সে এদিকে প্রথমে তেমন দৃষ্টি দিতে পারলে না। বাকী রইল ফ্রান্স। জার্ম্মান-যুদ্ধ ফ্রান্সের ভূমিতেই হয়েছিল। কাজেই অন্য কারুর সঙ্গে তার ক্ষতির পরিমাণের তুলনাই হয় না। জার্ম্মানীর শক্তি সে যেমন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছিল এমন কেউ করে নি। জার্ম্মানরা আবার যাতে প্রবল না হতে পারে সেই চেষ্টাই হ'ল ফ্রান্সের সব চেয়ে বেশী। সুতরাং মধ্য ইউরোপের এই নূতন রাষ্ট্রগুলির নেতৃত্ব করবার আকাঙ্ক্ষা মনে জাগা তার পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তার এই আশা শেষ পর্য্যন্ত যে সুফলপ্রসূ হয় নি তা তোমরা দেখ্‌তেই পাচ্ছ। অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীকে আলাদা করে দেবার পর অষ্ট্রিয়া জার্ম্মানীর সঙ্গে নানাভাবে মিলিত হতে চেয়েছিল, কিন্তু ফ্রান্সের প্রতিবন্ধকতায় প্রথমে তা সম্ভবপর হয় নি। চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া এই তিনটি রাষ্ট্র মিলে লিট্‌ল আঁতাত গঠন করা হ'ল। ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প পররাষ্ট্রনীতি—সব বিষয়ে তারা এক যোগে চল্‌বে স্থির হয়। রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস ও তুরস্ক মিলে হ'ল 'বলকান আঁতাত'

বলকান উপদ্বীপে এগুলি অবস্থিত বলে সকলে এদের নাম দিয়েছে বলকান রাষ্ট্র। এরও মূলে ছিল ফ্রান্স। ফ্রান্স পোল্যাণ্ডের সঙ্গেও পরস্পর সাহায্যমূলক চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এ সময়ে। চেকোশ্লোভাকিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে আলাদা চুক্তি হয়েছিল। মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপে ইটালীর ব্যবসা-বাণিজ্য কিছু প্রসার লাভ করলেও ফ্রান্সের বিশেষ আশঙ্কার কারণ ঘটে নি। কারণ এ সব দেশ আগে থেকেই তার নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তারই নির্দ্দেশ মত চল্‌তে সুরু করেছিল।

জার্ম্মানীকে কিন্তু দাবিয়ে রাখা চল্‌ল না। হিটলার একে জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত করে শীঘ্রই শক্তিমান করে তুল্‌লেন। হিটলারের উদ্দেশ্যের কথা আগে তোমাদের বলেছি। যে-সব রাষ্ট্রে জার্ম্মান রয়েছে সে-সব রাষ্ট্রের ভয় হবারই কথা। ইটালীও জার্ম্মানীর প্রতি এজন্য আগে প্রসন্ন ছিল না। অষ্ট্রীয়া জার্ম্মানীভুক্ত না হয় এ-ও ছিল তার ইচ্ছা। কেননা তা হলে তার দেশে যে-সব জার্ম্মান আছে তারাও তো জার্ম্মানীর সঙ্গে যুক্ত হতে চাইবে। তাই তখন মনে হয়েছিল ফ্রান্স ও ইটালী বুঝি একযোগে জার্ম্মানীর বিপক্ষে দাঁড়াবে। কিন্তু তা না হয়ে ঘটনাচক্রে অন্যরূপ হয়েছিল তোমরা জেনেছ।

মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপ থেকে ফ্রান্স তার হাত গুটাতে বাধ্য, ইটালীও তার দাবি-দাওয়া সব একরূপ ত্যাগ করে। হিটলার জার্ম্মানীর শাসন-ভার হাতে নিয়েই পূর্ব্ব ইউরোপে

তার আধিপত্য বিস্তারে মন দিলেন। অষ্ট্রীয়া, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, তুরস্ক সর্ব্বত্রই ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াবার নূতন উপায় অবলম্বন করা হ'ল। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন ভাবী সমরে সমুদ্র পথ তার পক্ষে রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। জার্ম্মানী এই সব দেশের কাঁচা মালের বেশীর ভাগ কিনে তার দাম বাকী ফেল্‌লে। অনেক দিন যায়, দাম শোধ হয় না। অথচ এ রাষ্ট্রগুলির টাকার খাক্‌তি খুবই। জার্ম্মান-সরকার তখন বললে, 'নগদ টাকার পরিবর্ত্তে তোমরা আমার কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় কর। এ সব তো তোমাদের দরকার হবে।' ছোট রাষ্ট্রগুলি অগত্যা তাই করতে বাধ্য হ'ল। এ দেশগুলিতে অন্যেরা যাতে ব্যবসা করতে না আসে জার্ম্মানী তারও ব্যবস্থা করল সঙ্গে সঙ্গে। এখান থেকে কাঁচা মাল চড়া দামে কিনে কম দামে ইউরোপের বাজারে সে বিক্রয় করতে লাগল। ক্রেতারাও দেখ্‌লে সুবিধা। অতদূরে টাকা খরচ করে গিয়ে চড়া দামে মাল কেনার দরকার কি? জার্ম্মানী এ ভাবে এই সব দেশ থেকে অন্যদের তাড়াবার উপক্রম করে। দ্বিতীয় মহাসমরের প্রথম দিকে সে তুরস্ক বাদে বলকান রাষ্ট্রগুলি সবই একে একে দখল করে নেয়। কিন্তু ক্রমে মিত্রশক্তি-বাহিনীর আক্রমণের প্রকোপে নিজ জার্ম্মানী রক্ষার জন্য তাকে ওসব অঞ্চল থেকে হাত গুটিয়ে নিতে হয়। জার্ম্মানীর পতন হওয়ার পর বৃহত্তর জার্ম্মানী গঠনের আশা আর নাই। ভবিষ্যতে এ দেশগুলি কার আওতায় আসে লক্ষ্য করার বিষয়।

—এক—

ফ্রান্স

ভের্সাই সন্ধি, ইটালী, জার্ম্মানী প্রভৃতি প্রসঙ্গে ফ্রান্সের কথাও তোমরা কিছু কিছু জেনে নিয়েছ। এখন এ দেশটি সম্বন্ধে আলাদা করে তোমাদের কিছু বল্‌ব। তোমরা ইতিহাসে ফরাসীদের সম্বন্ধে অনেক কথা পাবে। ভারতবর্ষে ইংরেজ ও ফরাসী উভয়ে একই সময়ে রাজ্য-বিস্তার করতে চেয়েছিল। এজন্য এখানে এদের ভিতরে অনেকদিন ধরে যুদ্ধ-বিগ্রহও চলে। ইউরোপেও এদের লড়াই চল্‌ত খুবই। ফরাসী বিপ্লবের শেষে ইংরেজরা বীর নেপোলিয়নকে যুদ্ধে হারিয়ে দেয় এবং সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে আটক রাখে। সেখানে নেপোলিয়নের মৃত্যু হয়। এসব কারণে ইংরেজের উপর ফরাসীরা বরাবর বিদ্বিষ্ট হয়েই ছিল। তবে রাজনৈতিক কারণে উনবিংশ

শতাব্দীর শেষে তারা ইংরেজের সঙ্গে বেশ মিলে মিশেই কাজ করতে সুরু করে।

বর্ত্তমানে শিক্ষা সভ্যতায় যেমন ইউরোপ সকল মহাদেশের শীর্ষে, তেমনি ইউরোপে আবার ফ্রান্সই সকল দেশের সেরা। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী ফ্রান্সেই প্রথম উচ্চারিত হয়। ফরাসী বিপ্লবই ইউরোপকে মধ্যযুগীয় অবস্থা থেকে বর্ত্তমান উন্নত অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে বলা যায়। এর পর থেকে এখানকার প্রত্যেক জাতি নবজাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়,—আগেকার সামন্ত রাজ্যগুলি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়,—ইউরোপে নূতন নূতন স্বাধীন রাজ্য সৃষ্টি হতে থাকে।

নেপোলিয়নের পরে ফ্রান্সে কখনো রাজতন্ত্র কখনো বা প্রজাতন্ত্র শাসন চল্‌তে থাকে। শেষে জার্ম্মানী কর্ত্তৃক বিজিত হবার পর বিগত ১৮৭১ সালে এ একটি পুরোপুরি রিপাব্লিক বা প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়। প্রজাতন্ত্র শাসন কাকে বলে জান? সেখানে রাজা থাক্‌বে না, সাধারণ লোকে ভোট দিয়ে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রেসিডেণ্ট বা সভাপতি নির্ব্বাচিত করবেন। ইনিই কিন্তু সর্ব্বেসর্ব্বা নন, যদিও আজকালকার রাজাদের চেয়ে এঁর ক্ষমতা ঢের বেশী। এ শাসনে সাধারণতঃ দুটি করে পার্লামেণ্ট বা প্রতিনিধি-সভা থাকে। তাদের ভিতর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। প্রেসিডেণ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের

নেতাকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন ; প্রধান মন্ত্রী আবার তাঁর সহকর্ম্মীদের বাছাই করে নেন্। আজকালকার ডিমোক্রাসী বা গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্রগুলিতেও এই ব্যবস্থা। তবে প্রজাতন্ত্র ও গণতন্ত্রে এইটুকু প্রভেদ করা যায় যে, প্রথমটিতে রাষ্ট্রের মাথায় থাকেন নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট, দ্বিতীয়টিতে থাকেন বংশানুক্রমিক রাজা। ফ্রান্স প্রথম শ্রেণীর, আর ব্রিটেন দ্বিতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্র। রাজার ক্ষমতা এখন খুবই সীমাবদ্ধ। কাজেই উভয় রকম শাসনকেই আমরা গণতন্ত্র বলে আখ্যা দিতে পারি। উভয়েতেই অধিকাংশেরই মত অনুসারে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়ে থাকে।

মাঝে মাঝে অদল-বদল হলেও ১৮৭১ সালের শাসনতন্ত্রই সে-দিন পর্য্যন্ত ফ্রান্সে বাহাল ছিল। এ শাসনতন্ত্রে সাত বছর পর পর প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হয়। এখানে দুটী পার্লামেণ্ট—প্রথমটিকে বলে চেম্বার অফ্ ডেপুটিজ্ বা প্রতিনিধি-পরিষদ, আর দ্বিতীয়টিকে বলে 'সেনেট'। সাবালক নরনারীর ভোটে প্রতিনিধি-পরিষদের সভ্যরা নির্ব্বাচিত হন। ইংলণ্ডের হাউস অফ্ কমন্স-এর ন্যায় এ পরিষদের ক্ষমতা খুবই বেশী। চার বছর অন্তর অন্তর সাধারণ নির্ব্বাচন হয়। এই চার বছরের মধ্যে সাধারণ নির্ব্বাচন আর হতে পারে না। কাজেই মন্ত্রীসভার পতন হলেও সেখানে প্রতিনিধি-পরিষদ ভেঙে দেওয়া হয় না। বিলাতে কিন্তু মন্ত্রীসভার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণ নির্ব্বাচনের

ব্যবস্থা। অল্প সময়ের মধ্যে ফ্রান্সে পঁচিশ ত্রিশ বার পর্য্যন্তও মন্ত্রীসভার পতন ঘটেছে তথাপি সাধারণ নির্ব্বাচন হয় নি। মন্ত্রীসভার এত বেশী বার পতন হবার বিশেষ কারণ আছে। ফ্রান্সে বহু দল। চার পাঁচটি দল একত্র না হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে মন্ত্রীসভা গঠন করা সেখানে সম্ভব হয় না। আবার বেশীদিন বিভিন্ন দলের মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলা বড়ই কঠিন কাজ। এজন্যই বার বার ঐরূপ মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। প্রতিনিধি-পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৬১৮। পঁচিশ বছর বা তদূর্দ্ধ বয়সের সকলেই এর সভ্য নির্ব্বাচিত হতে পারে। প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ব্যাপারে ফ্রান্সে কিন্তু এমন একটি ব্যবস্থা ছিল যা বিলাতে বা অন্যত্র কোথাও নেই। সেটা হচ্ছে—ফরাসী উপনিবেশগুলির কেউ কেউ এখানে প্রতিনিধি পাঠাতে পারত।

ফরাসীদের সাম্রাজ্য বেশ বড়। তবে ভারতবর্ষে তার জায়গা খুব কম। এখানকার চন্দননগর, পণ্ডিচেরী, কারিকল ও মাহি মাত্র ফ্রান্সের অধীন। এখান থেকে একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হতেন ঐ প্রতিনিধি সভায়। সেনেটেও ভারতবর্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা ছিল। ভারতবাসীরা কিন্তু প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়ে সেখানে যেতেন না। তাঁরা এদেশে বসে ভোট দিয়ে সেখানকার কোন ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করতেন। ফ্রান্সের পুরণো কয়েকটি উপনিবেশরই মাত্র এ

অধিকার ছিল। আবার কোন কোনটি, যেমন কোচীন-চীন মাত্র প্রতিনিধি-পরিষদেই প্রতিনিধি পাঠাতে পারত ;—সেনেটে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ক্ষমতা তাদের দেওয়া হয় নি। এর সদস্য সংখ্যা ৩১৪। এর ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। সেনেটে চল্লিশ বছর বা তদূর্দ্ধ বয়সী লোকেরা সভ্য নির্ব্বাচন করবার বা নির্ব্বাচিত হবার অধিকারী। এর ক্ষমতা বিলাতের হাউস অফ লর্ডসের চেয়ে কিছু বেশী। কেননা প্রতিনিধি পরিষদে কোন আইন পাস হলে সেনেট ইচ্ছা কর্‌লে তা নাকচ করে দিতে পারে।

ফ্রান্সের লোকসংখ্যা আমাদের বাংলাদেশেরই মত,[1] কিন্তু এর আয়তন শ্যামের মত বা বাংলা-বিহার-আসাম একত্র করলে যতখানি হয় প্রায় ততখানি। এর সাম্রাজ্যও যে খুব বড় তা তোমাদের বলেছি। আয়তনে ব্রিটিশ সম্রাজ্যের পরই এর স্থান বলা যায়। লোকসংখ্যা কিন্তু ব্রিটিশের তুলনায় এর খুবই কম,—ছয় কোটির কিছু বেশী। আফ্রিকার অধিকাংশ মরুভূমি এর মধ্যে রয়েছে বলে এখানকার লোকসংখ্যা এত কম। অধীন দেশগুলির সঙ্গে ফরাসীদের ব্যবহার অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের মতই নির্ম্মম। এখানে যে-সব প্রগতি বা স্বাধীনতামূলক আন্দোলন হয় তা তারা কঠোর হস্তে দমন করে থাকে। মাঝে সিরিয়ার উপর ফ্রান্সের ব্যবহার খুবই রূঢ় হয়ে উঠেছিল। এটি কিন্তু যুদ্ধের পরে প্রাপ্ত একটি 'ম্যাণ্ডেট'। নিছক প্রয়োজনের বশেই একে আবার কিছু স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া হয়েছিল ইদানীং।

এ থেকে এসে পড়ে ফ্রান্সের বর্ত্তমান অবস্থার কথা। বর্ত্তমান অবস্থা মানে—এক কথায়, তার বর্ত্তমান পররাষ্ট্র নীতির হালচাল। ১৮৭১ সালে জার্ম্মানীর কাছে সে হেরে যায়, তোমরা জেনেছ। এ সময় তার আলসেস-লোরেন জার্ম্মানীর হস্তগত হয়। এর পর থেকেই সে ব্রিটেনকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে বেশী করে চেষ্টা করে। এদিকে আবার ব্রিটেন ও জার্ম্মানীর রাজপরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান। কিন্তু তা হ'লে কি হবে? যখন দেখা গেল জার্ম্মানীর রাজ্য-লিপ্সা বেড়ে গিয়ে ব্রিটেনের স্বার্থেও আঘাত দিতে চাইছে তখন সে-ও হুসিয়ার হয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল। জার্ম্মানীর শক্তি বৃদ্ধিতে ফ্রান্সেরও যথেষ্টই ভয়ের কারণ ছিল। কাজেই গত ১৯০৬ সালে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ভিতর পরস্পর সাহায্যমূলক সন্ধি হয়ে গেল। তখন থেকেই সামরিক ব্যাপারে তারা একযোগে কাজ আরম্ভ করেছিল বলেই বিগত প্রথম মহাসমরে জার্ম্মানীর সম্মুখে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিল এবং জয়লাভও করেছিল।

গত মহাযুদ্ধের বেশীর ভাগই হয় ফ্রান্সের বুকের উপর। এজন্য তার ক্ষতিও হয়েছিল সকলের চেয়ে বেশী। জার্ম্মানীর উপর তাই তার জাতক্রোধ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নয়। ভের্সাই সন্ধিতেও এর ছাপ স্পষ্টই পড়েছিল। ভের্সাই ও পরবর্ত্তী সন্ধিগুলিতে জার্ম্মানী ও তার বন্ধুদের যেমন হীনবীর্য্য করে ফেলা হয়েছিল তাতে ফ্রান্সের আশ্বস্ত

হবারই কথা, কিন্তু সত্য কথা বল্‌তে কি, এত করেও সে তেমন আশ্বস্ত হতে পারে নি ;—এসব কথা তোমাদের আগেই বলেছি।

যুদ্ধের পর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপ থেকে হাত গুটিয়ে নিল। গত ১৯২২ সালে লয়েড জর্জ্জ মন্ত্রীসভার পতনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশের মনোভাবও জার্ম্মানীর উপর ধীরে ধীরে বদলাতে লাগ্‌ল। জার্ম্মানীর কাছ থেকে দ্রুত ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য ফ্রান্স রূঢ় প্রদেশ দখল করেছিল। এ কিন্তু তাকে সম্পূর্ণই নিজ দায়িত্বে করতে হয়, কেননা ব্রিটেন বা যুক্তরাষ্ট্র কেউ তার সাহায্যে আসে নি। ভের্সাই সন্ধির সময় মঁসিয়ে ক্লেমেন্সো ছিলেন ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী, তার পরে মঁসিয়ে পঁয়কারে প্রধান মন্ত্রী হন। উভয়েই ছিলেন কড়া মেজাজের লোক। বিধ্বস্ত জার্ম্মানীকে নানা রকমে অপদস্থ করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করতে চেয়েছিলেন তাঁরা! ফরাসী জনসাধারণ কিন্তু তাঁদের উপর বিরূপ হয়ে উঠল এই সব কারণে। এ সময় উদারপন্থী নেতা মঁসিয়ে ব্রিঁয়া ফ্রান্সের কর্ণধার হন। তিনি পরে পররাষ্ট্র-মন্ত্রীও হয়েছিলেন। তাঁর সময়ে জার্ম্মানীর সঙ্গে মিত্রশক্তিদের সত্যকার সন্ধি হ'ল লোকার্নো চুক্তিতে। এ চুক্তির কথা আগে তোমাদের বলেছি।

পররাষ্ট্র-নীতিতে অতঃপর কতকটা উদারতা প্রকাশিত হলেও অতীতকে ফরাসীরা মোটেই ভুল্‌তে পারলে না। তারা

যখন দেখ্‌লে যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে সরে দাঁড়িয়েছে, আর ব্রিটেনও জার্ম্মানীর উপর তেমন বিরূপ নয় তখন তাদের মনে খুবই অসোয়াস্তির ভাব দেখা দেয়। দু'ভাবে এর প্রতিকারের চেষ্টা আরম্ভ হ'ল। ফ্রান্স রণসম্ভার বাড়িয়ে চল্‌ল, পূর্ব্ব সীমা সুরক্ষিত করবার আয়োজনও করতে লাগল। ঘাঁটি ও দুর্গ নির্ম্মাণ করে আর খাদ কেটে এ অঞ্চল সুরক্ষিত করা হয়, আর এর নাম দেওয়া হয় 'মাজিনো লাইন'। ঠিক জার্ম্মানীর দিকেও ঐরূপ করা হয়। সে এর নাম দেয় 'সিগ্‌ফ্রিড লাইন'। রাষ্ট্র-সংঘ ইতিমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠে। অন্যূন ষাট্‌টি রাষ্ট্র তখন এর সভ্য-শ্রেণী ভুক্ত। ব্রিঁয়া প্রস্তাব করলেন, ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হোক। যুদ্ধ-বিগ্রহ বিবাদ-বিসম্বাদ রোধ করে পরস্পরের ভিতর ঐক্য স্থাপন করতে হলে এরূপ রাষ্ট্র গঠন একান্ত আবশ্যক। এ কথায় কিন্তু তখন কেউ কর্ণপাত করলে না। তিনিও সহজে ছাড়বার পাত্র নন্, যখন তাঁর এ চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল তখন তিনি বল্‌লেন, সভ্যগণকে দিয়ে রাষ্ট্র-সংঘের আদেশ মান্য করাতে হলে তার উপযুক্ত সৈনবাহিনী থাকা চাই। এ ব্যতিরেকে আদেশ মান্য করানো সম্ভব নয়।

ব্রিঁয়ার এ প্রস্তাবে তখন কিন্তু কেউ সাড়া দিলে না। কিন্তু এটি ত প্রকৃত সত্য কথা যে, পিছনে উপযুক্ত শক্তি না থাকায় রাষ্ট্র-সংঘের আদেশ অগ্রাহ্য করতে কেউ দ্বিধাবোধ করে নি।

পরে আবার অনেকে ব্যক্তিগতভাবে ব্রিঁয়ার প্রথম প্রস্তাবটি উল্লেখ করে বলেছিলেন যে, ইউরোপে একটি যুক্ত-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হলে তার সমস্যা ঘুচবে না, স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠারও আর আশা থাকবে না। ব্রিঁয়া যখন দেখলেন তাঁর সব প্রস্তাবই একে একে বাতিল হয়ে যাচ্ছে তখন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ কেলগের সঙ্গে কেলগ-ব্রিঁয়া প্যাক্ট নামে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। এর মর্ম্ম হ'ল, জগতের প্রত্যেক রাষ্ট্রকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে—ভবিষ্যতে কেউ কারো বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করবে না। এ নির্ব্বিবাদী প্রস্তাবে সকলেই সায় দিলে। ইটালী, জার্ম্মানী, জাপানও তখন এতে সায় দিতে দ্বিধাবোধ করলে না। ব্রিঁয়া ১৯৩১ সালে মারা গেলেন! ব্রিঁয়া যেমন তেমন লোক ছিলেন না। তিনি এগার বার ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী ও ষোল বার পররাষ্ট্র-মন্ত্রী হয়েছিলেন! অন্যান্য বিভাগেও তিনি মন্ত্রীত্ব করেছিলেন কয়েক বার।

ফ্রান্সের শাসন-ভার যখন যে দলের হাতেই থাকুক না কেন, দেশরক্ষা ব্যাপারে কিন্তু সকলেই সমান তৎপর। ব্রিঁয়া একরকম ভাবে চেষ্টা করেছেন, অন্যেরা অন্যভাবে চেষ্টা করেছেন—এই যা তফাৎ। পূর্ব্বেকার সাম্রাজ্যগুলি ভেঙে মধ্য ইউরোপে যে-সব নূতন রাষ্ট্র গঠন করা হয়েছে ফ্রান্স তাদের হাত করতে চেয়েছে অবিরত। নূতন অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীতে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করে সে তাদের টাকা জোগান দিয়েছে। অন্যান্য

রাষ্ট্রকে এক একটি গোষ্ঠীভুক্ত করে রাখ্‌তেও চেষ্টা করে সে। চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া ও য়ুগোশ্লাভিয়াকে নিয়ে করা হয় 'লিটল আঁতাত' আর রুমানিয়া য়ুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, তুরস্ক নিয়ে হয় বলকান আঁতাত, আগে তোমাদের বলেছি। ফ্রান্স মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপে এই আঁতাত-রাষ্ট্রগুলি মারফত নিজ প্রভাব বিস্তার করতে লেগে গেল। এতে সে অনেকটা সক্ষমও হ'ল। কিন্তু ১৯৩১ সালের আরম্ভেই যে বিশ্বব্যাপী বাজার মন্দা দেখা দেয় তাতে তাকে প্রচুর পরিমাণে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়, এবং সে ক্রমশঃ ও-সব অঞ্চল থেকে হাত গুটাতে বাধ্য হয়।

এর কিছু পরেই জার্ম্মানীতে হিটলারের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে ফরাসীরাও চিন্তিত হয়ে পড়ল খুবই। কারণ তারা হিটলারের আত্মজীবনী পাঠ করে ফ্রান্সের উপর তাঁর আক্রোশের কথা আগেই জেনে নিয়েছিল। ফরাসীরা ইংরেজের উপরও তেমন করে নির্ভর করতে পারলে না, কারণ তারা যেন তখন জার্ম্মানভক্ত হয়ে পড়েছে বেশী মাত্রায়। অথচ হিটলারকে ফ্রান্সের বাগমানানো চাই-ই। হিটলার যদিও মুসোলিনীর নীতি অনুসরণ করেই জার্ম্মানীতে প্রভুত্ব লাভ করেন তথাপি মুসোলিনী তাঁকে প্রথমে ভাল চক্ষে দেখ্‌তে পারেন নি। জার্ম্মানীর শক্তি বাড়লে তার যে ভয়! বিশেষতঃ অষ্ট্রিয়া— যার উপরে হিটলারের খুবই লোভ, একবার জার্ম্মানীভুক্ত হলে

তিনি ইটালীর সীমানায় এসে পড়বেন। তাই এই অবসরে ফ্রান্স ও ইটালীর ভিতর বন্ধুত্ব বেড়ে গেল। গত ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে ফ্রাঙ্কো-ইটালিয়ান চুক্তি দ্বারা এই বন্ধুত্ব পাকা করবার চেষ্টা হয়। তখনকার ফরাসী পররাষ্ট্র-সচিব মঁঃ লাভাল আফ্রিকায় ইটালীকে অত্যধিক ক্ষমতা দিয়ে মুসোলিনীকে দলে টানবার চেষ্টা করেন।

এর আগে ফ্রান্স পোল্যাণ্ডের সঙ্গে সন্ধিতে আবদ্ধ হয়েছিল। সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে এযাবৎ তার কোনরূপ আঁতাত হয় নি। এবার কিন্তু উভয়ের ভিতর একটা সাহায্যমূলক চুক্তিও সাধিত হ'ল। ফ্রান্স চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে একটি চুক্তি করে নিলে। এ সময় চার দিককার রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে তার। এরূপ সন্ধিবদ্ধ হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। হিটলার তখন রাষ্ট্রসংঘ পরিত্যাগ ক'রে ও ভের্সাই সন্ধির অনেকগুলি শর্ত্ত একে একে ভঙ্গ করে জার্ম্মানীর শক্তি বাড়াবার জন্য উঠে পড়ে লেগে যান। ফ্রান্স অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল তখনই যখন সে দেখ্‌লে যে, হিটলারের নানারকম হঠকারিতার মধ্যেই ব্রিটেন তাঁর সঙ্গে একটা নৌ-চুক্তিও করে নিলে!

জার্ম্মানী কি অজুহাতে অস্ত্র-শস্ত্র বাড়িয়ে চলেছিল তা আগে তোমাদের বলেছি। ফ্রান্স জার্ম্মানীকে যে মোটেই বিশ্বাস করত না তাও তোমরা জান। কাজেই জার্ম্মানীর ইচ্ছামত

নিজ অস্ত্রশস্ত্র কমাতে ফ্রান্স রাজী হয় নি। এর পরে রাজনীতির পট অতি দ্রুত বদ্‌লে যায়। ফ্রাঙ্কো-ইটালীয়ান চুক্তি বিধিবদ্ধ হবার কিছুকাল পরেই কেমন করে ফ্রান্স ও ইটালীর ভিতর ছাড়াছাড়ি সুরু হয়, আর কিরূপেই বা উভয়ে শত্রু পর্য্যায়ে এসে দাঁড়ায় সে কথা ইটালী প্রসঙ্গে বলেছি। প্রতিবেশী জার্ম্মানী ও ইটালী তখন ফ্রান্সের ঘোর বিরোধী হয়ে পড়ে। তারা স্পেনের অন্তর্বিপ্লবে বিদ্রোহী ফ্রাঙ্কোকে নানাভাবে সাহায্য ক'রে তাকে বিজয়ী করে তোলে। ব্রিটেন এবং ফ্রান্সও জয়ের মুখে ফ্রাঙ্কোকে স্বীকার করে নিতে দ্বিধা করলে না!

এক সময়ে ফ্রান্স নানাদেশের সঙ্গে সন্ধি ও চুক্তি করে জার্ম্মানীর সঙ্গে আড়ি দিয়ে চলতে চেষ্টা করেছিল। অথচ এবার এই ফ্রান্সই নানা দিক থেকে আক্রান্ত হবার উপক্রম হয়। এরূপ অবস্থা দেখে ইটালী আগেকার চুক্তি বাতিল করে দিয়ে তার কর্সিকা, টিউনিস, সুয়েজ ও জিবুতি দাবি করে বসল! এসব ছেড়ে দিতে কিন্তু ফ্রান্স তখন একেবারেই গররাজী ছিল।

পরে কিন্তু হাওয়া আবার বদ্‌লে যায়। চেকোশ্লোভাকিয়ার বিনাশের পর ফ্রান্স ও ব্রিটেন এক সঙ্গে সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে নূতন চুক্তি করবার চেষ্টা করে বিফল মনোরথ হয়। এবং জার্ম্মানী ও সোভিয়েট রুশিয়ার মধ্যে চুক্তি হওয়ায় রাজনৈতিক পট আশ্চর্য্যরকম পরিবর্ত্তিত হয়। পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হলেই ফ্রান্স ও ব্রিটেন জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

এর পর কয়েক মাসের মধ্যেই উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির উপর জার্ম্মানী বিপুল বাহিনী নিয়ে কিরূপ চড়াও হয় আগে তাও তোমাদের বলেছি। ফ্রান্স ব্রিটেনের সঙ্গে এ সব অঞ্চলেও জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। সুরক্ষিত মাজিনো লাইন থেকে জার্ম্মানীর অভ্যন্তরে গোলাগুলিও কিছু বর্ষণ করে তারা। কিন্তু জার্ম্মান-বাহিনী বেলজিয়ম জয় করে তার ভিতর দিয়ে যখন ফ্রান্সের সীমা অতিক্রম করলে তখন সেনাপতি ওয়েগাঁর নেতৃত্বে ফরাসী-বাহিনী স্বদেশ-রক্ষায় প্রাণপণ করেও তাদের বিরুদ্ধে কিছু করে উঠতে পারলে না। জার্ম্মানীর অভিনব রণকৌশল ও শ্রেষ্ঠতর শক্তির সম্মুখে ফ্রান্সের পক্ষে পনর দিনও টিকে থাকা সম্ভব হ'ল না। ১৯৪০ সালের ১৪ই জুন জার্ম্মান-বাহিনী ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে প্রবেশ করে। এর কিছু আগেই ফরাসীরা প্যারিসকে 'উন্মুক্ত নগরী' ঘোষণা করে অন্যত্র চলে যায়। অশীতিপর প্রধান মন্ত্রী মার্শাল পেঁতা উপায়ান্তর না দেখে পরবর্ত্তী ১৭ই জুন যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন। তার পূর্ব্বেই ফ্রান্সের একটি প্রধান অংশ জার্ম্মানীর হাতে চলে গিয়েছিল। মার্শাল পেঁতা হিটলারের সঙ্গে অবিলম্বে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এর ফলে ফ্রান্সের সাধারণতন্ত্রমূলক শাসন ব্যবস্থার অবসান হ'ল, পেঁতাই রাষ্ট্রে সর্ব্বেসর্ব্বা ('চীফ অফ্ ষ্টেট') হলেন। পিয়ারে লাভাল প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য করতে লাগলেন। ব্রিটেনের উপকূলে ও সাম্রাজ্যের অন্যত্র যে-সব ফরাসী নৌবহর

ছিল ব্রিটিশ সরকার তা আটক করলেন। ভিসি শহর তখন ফ্রান্সের রাজধানী হয়।

ফরাসী সরকারের তখনকার নীতির বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হন দ্য গলে। তিনি ফ্রান্সের একজন বিখ্যাত অধিবাসী। ইংলণ্ডে বসে তিনি একটি স্বাধীন-ফ্রান্স রাজ্য ও স্বাধীন ফরাসী-বাহিনী গঠন করেন ও ফ্রান্সকে জার্ম্মানবিরোধী কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেন। ফরাসীর অধিকারভুক্ত সিরিয়া এদেরই অধীন হয়েছিল। সিরিয়ার প্রতি এদের ব্যবহার মোটেই আশাপ্রদ নয়। সিরিয়ার লেবানন প্রদেশ স্বাধীন হবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করে এদের হস্তে বিশেষভাবে নাজেহাল হয়।

অন্য দিকে জাপান ফরাসী সরকারের সঙ্গে চুক্তি করে নিয়ে ইন্দো-চীনকে নিজ প্রয়োজনে লাগায়। তার আর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজ অধিকারে নিয়েছে। মার্শাল পেঁতার পর ইটালী ও জার্ম্মানীর বন্ধু মঁসিয়ে লাভাল ফ্রান্সের সর্ব্বেসর্ব্বা হয়েছিলেন। লাভাল অক্ষশক্তিদের সঙ্গে একযোগে ইউরোপের পুনর্গঠন প্রয়াসী হলেন।

মঃ লাভাল যে নীতি অনুসরণ করে চলেন, ফ্রান্সের ভিতরে এক শ্রেণীর ক্ষমতাশালী লোক যে তা পছন্দ করেন নি, নানা ভাবেই তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। ফরাসী-নৌবহর ব্যবহার সম্পর্কে যখন হিটলারের সঙ্গে ফরাসী-সরকারের কথাবার্ত্তা চলে সেই অবসরে এর কর্ত্তারা সকলের অজ্ঞাতসারে নৌবহর নিয়ে

আফ্রিকায় পালিয়ে যান। যে-সব রণতরী পালাতে পারে নি তাও ফরাসী উপকূলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। ফরাসী-নৌবহর অনুকূল হওয়ার জন্যই আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলে মিত্রশক্তির পক্ষে মার্কিন সেনাদল অবতরণ করতে সক্ষম হয়। আর প্রধানতঃ এই মার্কিন-বাহিনীর দ্রুত অগ্রগতির ফলেই, জার্ম্মান-সেনা উত্তর-আফ্রিকা হতে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে চলে আস্‌তে বাধ্য হয়। ফরাসী নৌ-বিভাগের উক্ত কার্য্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা বল্‌তে হবে। এর ফলেই ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধের মোড় ফিরে যায়। এর পরবর্ত্তী ঘটনা ইটালী জার্ম্মানী প্রসঙ্গে প্রায় তোমাদের বলেছি। ফ্রান্স এখন বিদেশীর কবলমুক্ত স্বাধীন। জার্ম্মানী শাসনের জন্য যে সাময়িক ব্যবস্থা হয়েছে তাতে ফ্রান্সও একজন অংশী।

সান ফ্রান্সিসস্কো ও অন্যান্য বৈঠকে ফ্রান্স সগৌরবে যোগদান করেছে ইদানীং। বর্ত্তমানে দ্য-গলে ফ্রান্সের কর্ণধার। তবে ফ্রান্স হয়ত বেশী দিন তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিতে চাইবে না—তার লক্ষণ এর মধ্যেই প্রকাশ পাচ্ছে।

ওদিকে দেশদ্রোহিতামূলক অপরাধের জন্য বিচারে নব্বই বৎসরের বৃদ্ধ মার্শাল পেঁতার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বলে দ্য গলে পূর্ব্বকৃতির কথা স্মরণ করে তাঁর মৃত্যুদণ্ড মকুব করে যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দিয়েছেন।

—দুই—

ব্রিটেন

ব্রিটেনও আত্মরক্ষার প্রয়োজন বেশী করে অনুভব করেছিল গত কয়েক বছর ধরে। দেশের রণ-সম্ভার বৃদ্ধির জন্য সে একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে কাজ আরম্ভ করে। এ কাজে সে ব্যয় করেছে কত জান? তিন শ' কোটি পাউণ্ড, অর্থাৎ চার হাজার, সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা। এ পরিকল্পনা শেষ হতে না হতেই ১৯৩৯-৪০ সালে আশী কোটি পাউণ্ড বা হাজার বার শ কোটি টাকা খরচের বরাদ্দ হয়!

তখন ইউরোপে এমন কতকগুলি ব্যাপার দ্রুত ঘটেছিল যাতে ব্রিটেনের পক্ষে এরূপ আয়োজন না করে উপায়ান্তর ছিল না। মধ্য-ইউরোপে জার্ম্মানী নিজ শক্তি অসম্ভব রকম বাড়িয়ে নেয়। সে কার উপর কখন চড়াও হবে ঠিক ছিল না। চেকো-শ্লোভাকিয়ার প্রতি তার ব্যবহার তোমরা জেনে নিয়েছ। এর প্রথম বার অঙ্গচ্ছেদ করা হয় জার্ম্মানীর মিউনিক শহরে বসে, আর এ ব্যাপারে প্রধান পাণ্ডা ছিলেন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন। ফ্রান্স ও সোভিয়েট রুশিয়া চেকোশ্লোভাকিয়াকে রক্ষার জন্য দায়ী ছিল। ব্রিটেনের পক্ষে এরূপ কোন দায়িত্ব মেনে নিতে তিনি রাজী হলেন না, যদিও রাষ্ট্র-সংঘের বিধি অনুসারে প্রত্যেক সভ্যই প্রত্যেক সভ্যকে রক্ষা করতে বাধ্য! মধ্য

ব্রিটেন

ইউরোপে জার্ম্মানীর স্বার্থ কিন্তু ব্রিটেন আগেই স্বীকার করে নিয়েছিল। হিটলার সমগ্র জার্ম্মান জাতিকে যে এক করতে চান তাতে ব্রিটেন বাদ সাধবে না এরূপ বলা হয়। তাই সুদেতেন জার্ম্মান অঞ্চল জার্ম্মানীকে ছেড়ে দিতে চেম্বারলেন রাজী হয়েছিলেন। তখন অন্যত্র, এমন কি বিলাতেও কিন্তু রব উঠে যে, ব্রিটেন চেকোশ্লোভাকিয়ার অঙ্গচ্ছেদে রাজী হয়ে তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই করেছে! ফ্রান্সের ততটা নিন্দা হয় নি। কারণ তোমরা তো আগেই জেনেছ ব্রিটেন ছাড়া তার তখন আর এক পাও নড়বার জো ছিল না। বিটেন, ফ্রান্সের ন্যায় চেকোশ্লোভাকিয়াও ছিল একটি গণতন্ত্র। তার প্রতি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির এরূপ ব্যবহার দেখে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই অনেকে সন্দিহান হলেন।

জার্ম্মানী কিন্তু এতে নিরস্ত হয় নি। মিউনিক চুক্তির সমস্ত শর্ত্তই ভঙ্গ করে চেকোশ্লোভাকিয়াকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেললে! এবার ব্রিটেনের সুস্থ হয়ে বসে থাক্‌বার উপায় রইল না। যে নীতির বশবর্ত্তী হয়ে সে পূর্ব্বে জার্ম্মানকে সমর্থন করেছিল এর ভিতর তার নামগন্ধও খুঁজে পেল না। চেকরা, শ্লোভাকরা এক একটী ভিন্ন ভিন্ন জাত। তাদের রাজ্য গ্রাস করার কোন অধিকার জার্ম্মানীর নেই। জার্ম্মানীর পররাজ্য-হরণ কার্য্যে গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্র মাত্রেই তখন বিচলিত হয়ে উঠে। ফ্রান্স, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, তুরস্ক, গ্রীস সকলেই

তখন ভাবতে লাগ্‌ল, ভবিষ্যতে জার্ম্মানী কর্ত্তৃক অন্য কোন দেশ আক্রান্ত হলে তাকে কিরূপে বাধা দেওয়া যাবে। বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে ব্রিটেন যে নেতৃত্ব হারিয়েছে বলে বোধ হয়েছিল এসময় তা আবার ফিরে পাবার সম্ভাবনা ঘটল।

ব্রিটেন কি কারণে জগতে নেতৃত্ব কর্‌তে সক্ষম হয়েছিল? তার বিশাল সাম্রাজ্যের কথা তোমরা বইয়ে পড়েছ—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য্য অস্ত যায় না! এ শুধু বিশাল নয়, বহু বিস্তৃতও বটে। এ বিষয়ে সে সকল দেশের সেরা। কিন্তু এর জন্য তার লাঞ্ছনাও কম হয় নি! তার শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন হয়। অন্যান্য জায়গার প্রবাসী শ্বেতাঙ্গরাও আন্দোলন চালিয়ে তার কাছ থেকে স্বায়ত্ত-শাসন আদায় করে নিয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ জাতিগুলির উপর তার কঠোর শাসন চলছে এখনও। ভারতবাসী আমরা, তা খুবই বুঝতে পারছি! অধীনস্থকে দমন করে রাখতে সব সাম্রাজ্য-ওয়ালা দেশই সমান। তবে কিসের জন্য ব্রিটেনের এত মর্য্যাদা? তার শাসন-নীতিই তাকে এ মর্য্যাদা দান করেছে। তার শাসন ব্যবস্থা যুগে যুগে বিদেশীর বিস্ময় জগিয়েছে। এমন একদিন ছিল, যখন সকলেই তাঁর আদর্শে নিজ নিজ দেশের শাসন-তন্ত্র গড়ে নিতে চেয়েছিল। এক কথায় এর নাম দেওয়া হয়েছে 'ডিমোক্রাসি' বা গণতন্ত্র। আজকাল অন্য রকম শাসন-ব্যবস্থাও দেখা দিয়েছে। গণতন্ত্রমূলক শাসনের

কর্ম্মপটুতা ও কর্ম্মতৎপরতা সম্বন্ধে প্রশ্নও উঠেছে আজ, তথাপি এ নীতিই এখনও সকলেরই প্রীতি আকর্ষণ করে।

ব্রিটেনের শাসন-তন্ত্রের সঙ্গে তার ইতিহাস ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িয়ে আছে। তোমরা ব্রিটেনের ইতিহাস যত পড়্‌বে, শাসন-তন্ত্রের তাৎপর্য্যও তত বুঝতে পারবে। রাজার কাছ থেকে প্রজাদের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার কাহিনী বড়ই বিচিত্র। ক্রমওয়েল সাধারণের পক্ষ নিয়ে রাজার শিরশ্ছেদ পর্য্যন্ত করেছিলেন! সে আজ তিন শ' বছর আগেকার কথা! এরূপ শত শত বিপর্য্যয়ের ভিতর থেকে ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থা আজ বর্ত্তমান আকার ধারণ করেছে। পার্লামেণ্টের মত নিয়ে মন্ত্রীসভাই সব কাজ করে থাকেন। রাজাকে সম্মতি জানিয়ে চল্‌তে হয় এই মাত্র। এখানকার পার্লামেণ্ট বা আইন সভা দু'ভাগে বিভক্ত। একটির নাম হাউস অফ কমন্স, অন্যটির নাম হাউস অফ্ লর্ডস্। হাউস অফ লর্ডসের ক্ষমতা খুবই সামান্য। দেশের সম্ভ্রান্ত লর্ড-বংশীয়দের নিয়েই প্রধানতঃ এই সভা গঠিত হয়েছে। রাজা অবশ্য মন্ত্রীসভার নির্দ্দেশ মত লর্ড উপাধি দিয়ে কয়েকজনকে এখানে পাঠাতে পারেন। হাউস অফ লর্ডসের সদস্য সংখ্যা ৭৪০। হাউস অফ কমন্সই সর্ব্বেসর্ব্বা। এখানকার সদস্য সংখ্যা ৬১৫। আইন-কানুন, যুদ্ধ-বিগ্রহ সকল ব্যাপারে এর সিদ্ধান্তই চরম। আয়ার্লণ্ডও আগে এখানে

প্রতিনিধি পাঠাতে পারত। তখন সদস্য সংখ্যাও ছিল বেশী।

রাজাকে বাদ দিলে বর্ত্তমান রিপাব্লিক ও ডিমোক্রাসিগুলি সবই একই ধরণের বলা চলে। আজকাল সঙ্কটজনক ব্যাপারেও রাজার নাম প্রায় শোনা যায় না। প্রধান মন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীর সহযোগে সব সমস্যার মীমাংসা করে থাকেন।

ব্রিটেন একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। লোকসংখ্যা বাংলাদেশেরই মত, প্রায় পাঁচ কোটি। ইংলণ্ড ওয়েল্স ও স্কটল্যাণ্ড এই তিনটি অঞ্চল নিয়ে হ'ল গ্রেট ব্রিটেন। গ্রেট ব্রিটেনকেই আমরা সংক্ষেপে ব্রিটেন বলি। আয়ার্লণ্ড পার্শ্ববর্ত্তী আর একটি দ্বীপ। আয়তনে বাংলাদেশের ছোট ছোট দু-তিনটি জেলার মত। লোকসংখ্যাও আমাদের দু-তিনটি জেলার মত। একেও আগে ব্রিটেনের সঙ্গে একত্র করে বলা হ'ত।

আয়ার্লণ্ডের উপর অত্যাচার বড়ই মর্ম্মন্তুদ কাহিনী। যে ক্রমওয়েল ইংলণ্ডের শাসন ব্যবস্থা নিজেদের হাতে আনবার জন্য এত চেষ্টা করেছিলেন তিনই এক সময়ে এই আয়ার্লণ্ডকে অধীন রাখবার জন্য অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিলেন! প্রায় সাত শ' বছর সংগ্রাম চালাবার পর এ অনেকটা স্বাধীন হয়েছে। ডি ভ্যালেরা এখন এদেশের অবিসংবাদিত নেতা। আয়ার্লণ্ডের উত্তর দিককার ছ'টি জেলা কিন্তু এখনও ইংলণ্ডের সঙ্গে একযোগে চল্ছে, এমন কি আয়ারের (প্রায়-স্বাধীন আয়ার্লণ্ডের নূতন

নাম) বিরোধিতা করতেও ক্ষান্ত হচ্ছে না। ব্রিটিশের বহু দিনের অবলম্বিত ভেদনীতি বা রাজ্যের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি করে শাসন চালাবার ব্যবস্থা এর জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

সাম্রাজ্যের জোরেই ব্রিটেন এত শক্তিমান্। ইংরেজদের কিন্তু ছ' মাসের খোরাক জন্মে না নিজ দেশে। এ দেশটি মোটেই কৃষি-প্রধান নয়, এদিকে চেষ্টাও বিশেষ হয় নি। ইংরেজরা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ থেকে কাঁচা মাল সস্তা দামে কিনে এনে নিজেদের কারখানায় নানা রকম শিল্প-দ্রব্য উৎপন্ন করছে,—উৎপন্ন দ্রব্যও আবার ঐ সব স্থলে চালান দিচ্ছে অনেক বেশী মূল্য নিয়ে। এতে করে তার ধনসম্পদ অসম্ভব রকম বেড়েছে। যেমন, আমাদের দেশে যে-সব পাট জন্মে, বিলেতে পাঠিয়ে তা থেকে নানা মূল্যবান জিনিষ তৈরী করানো হয়। এক টাকার পাটে দশ টাকার মাল উৎপন্ন হয়। আমরা পাট বিক্রয় করে যে দাম পাই তার দশগুণ মূল্য দিতে হয় আমাদের ঐ পরিমাণ উৎপন্ন মাল কেনবার সময়। এর ফলে ব্রিটেনের ব্যবসা-বাণিজ্যও ঢের প্রসার লাভ করেছে।

গত মহাযুদ্ধের পর থেকে প্রাচ্যে ব্রিটেনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়ায় জাপান। এ কারণ তার ব্যবসা-বাণিজ্যের কতকটা হানি হয় সত্য, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে এখনও জগতে সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। জগতে যত লোক আছে তার এক বিশিষ্ট অংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত। এক ভারতবর্ষেই আছে প্রায় চল্লিশ কোটি লোক।

অতটুকু ক্ষুদ্র দ্বীপের অতি সামান্যসংখ্যক লোক আজ জগতে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী, আর তার শক্তি-সামর্থ্যও এখন সকলের শীর্ষে। এত বড় শক্তি সে কিন্তু একদিনে লাভ করতে পারে নি। স্পেন সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসাবে সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভ থেকেই তার রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন সুরু হয়। স্পেন, পর্ত্তুগাল, দিনেমার, ওলন্দাজ, ফরাসী প্রভৃতি সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকেই একে একে সে আসর থেকে হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে।

ব্রিটেনের সাম্রাজ্য নানা স্থানে ছড়ানো, তাই একে রক্ষা করার অসুবিধাও খুব! ব্রিটেন বরাবর কূটনীতির আশ্রয় নিয়ে চলেছে, আর একই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় লড়াই করতেও চায় নি কখনো। প্রথম মহাসমরেও এই পন্থা অবলম্বিত হয়েছিল। পরে কিন্তু এর পরিবর্ত্তন ঘটে। ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা সব জায়গাতেই তার শত্রু। তাই অনেকে মনে করেন, জার্ম্মানীর মিউনিকে বসে চুক্তি করতে ব্রিটেন যে বাধ্য হয়, তার প্রধান কারণ, তখন পূব দিক থেকে জাপান আর পশ্চিম দিকে ইটালী কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ আক্রান্ত হবার খুবই সম্ভাবনা ঘটে। এ সময় চীনের ভিতরে জাপান অনেক দূর অগ্রসর হয়। ইটালীও তখন ভারত মহাসাগরের তীরে এসে পৌঁছে। কাজেই ব্রিটেনকে সব দিক সামলাবার জন্যই চেষ্টা করতে হয়েছিল।

ব্রিটেন

ইউরোপ ও আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ব্রিটেনের বর্ত্তমান সম্বন্ধ কিরূপ তা একবার দেখা যাক্। এক সময়ে সাম্রাজ্যওয়ালা রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে অনেক লড়াই হলেও পরে সে তাদের সঙ্গে খুবই আঁতাত করে নিয়েছিল। নূতন করে কেউ তার শক্তির পথে না দাঁড়ায় এটাই ছিল তার প্রধান লক্ষ্য। রুশিয়া কিন্তু এক সময়ে তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছিল। ইউরোপে জার্ম্মানী ও তুর্কী আর এশিয়ায় জাপানের সঙ্গে মিতালী করে রুশকে ঠেকিয়ে রেখেছে বরাবর। পরে যখন পোর্ট আর্থারের যুদ্ধে রুশিয়া জাপানের মত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের কাছে হেরে গেল তখন থেকে তাকে ভয় করবার আর কোন কারণ রইল না। তবে জাপানের সঙ্গে ব্রিটেনের মিত্রতা আরও পাকা হ'ল। ওদিকে ইউরোপে নূতন শক্তি দেখা দিল জার্ম্মানী। অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও ইটালীর সঙ্গে সন্ধি করে ব্রিটেনের শক্তিমূলে ঘা দেবার আয়োজন করলে সে। ব্রিটেন কালবিলম্ব না করে ফ্রান্স ও রুশিয়ার (যে রুশিয়া ছিল একদিন তার পক্ষে জুজু) সঙ্গে সন্ধি করে নিল জার্ম্মানীকে ঠেকাবার জন্য। এই রেষারেষির ফলেই হ'ল প্রথম মহাসমর। তোমরা বড় হলে "Balance of Power" বা ভারসাম্য নামে একটি কথা পাবে। ব্রিটেনের উদ্দেশ্য ইউরোপে এই ভারসাম্য বজায় রাখা। এজন্যই রুশিয়া ও জার্ম্মানীর সঙ্গে তাকে পর পর বোঝাপড়া করতে হয়েছিল। এই নীতি আজকের নয়, বহুদিনের পুরনো।

প্রথম মহাসমরে যখন জার্ম্মানী হেরে গেল, আর রুশিয়ায় বিপ্লব দেখা দিল তখন আগেকার মত শক্তির সমতা রক্ষা করার আর বিশেষ প্রয়োজন রইল না ব্রিটিশের। তখন রাষ্ট্র-সংঘের সভ্য অনেকেই। কথা উঠ্‌ল সকলে মিলে মিশে সমষ্টিগত ভাবে নিজেদের রক্ষা করে চলবে। এর নাম দেওয়া হ'ল "Collective Security" অর্থাৎ সমষ্টিমূলক নির্ব্বিঘ্নতা। কোন রাষ্ট্র অন্য কোন রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত হলে আক্রমণকারীকে সংঘের সভ্যগণ সমবেত ভাবে বাধা দেবে—ও কথাটির এ-ই হ'ল প্রকৃত তৎপর্য্য। এতে তখন অনেকেরই প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। অনেক দুর্ব্বল অথচ স্বাধীন রাষ্ট্র এর সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হ'ল এই আশায় যে, ভবিষ্যতে কোন প্রবল রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত হলে সে অন্যদের সাহায্য পাবে। আবিসিনিয়া, আফগানিস্তান বা চীন এই ভেবেই রাষ্ট্রসংঘের সভ্য হয়েছিল। ব্রিটেনও এই নীতি মেনে নিয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে সম্মেলনও ডাকা হয় অনেকবার—প্রবল রাষ্ট্রগুলির নৌবাহিনী, স্থলবাহিনী ও রণসম্ভার কমাবার জন্য। কিন্তু যে উপায়ে ঐ নীতি কার্য্যকর হতে পারে তার চেষ্টা ব্রিটেন মোটেই করলে না। ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মঁসিয়ে ব্রিঁয়ার রাষ্ট্রসংঘের সৈন্যবাহিনী গঠন বা ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের প্রস্তাবে কর্ণপাতই করলে না। পরে আবার পশুশক্তি প্রবল হয়ে উঠ্‌ল,—রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘর্ষ সুরু হ'ল। জাপান কর্ত্তৃক চীনের মাঞ্চুরিয়া অধিকারের সময়

থেকেই বর্ত্তমান বিশৃঙ্খল যুগ আরম্ভ হয়। জার্ম্মানীর রাষ্ট্রসংঘ ত্যাগ ও ভের্স্াই সন্ধির শর্ত্তগুলি একে একে ভঙ্গ করা, ইটালীর আবিসিনিয়া অধিকার, স্পেনে অন্তর্বিপ্লব, জাপানের চীন অভিযান, চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা হরণ, পোল্যাণ্ড, নরওয়ে, ডেনমার্কের বিলোপ সাধন, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম আক্রমণ সকলই এই বিশৃঙ্খল যুগকে ক্রমশঃ জটিল করে তুলে। রাষ্ট্রসংঘ কোথায় তলিয়ে গেল।

ব্রিটেন আবার তার পূর্ব্ব নীতিতে ফিরে গেল। সমষ্টিমূলক নির্ব্বিঘ্নতার দোহাই দিয়ে আর চল্‌ল না, শক্তির সমতা বিধানই তার পক্ষে এখন অধিকতর প্রয়োজন হয়ে পড়ল। জার্ম্মানী-জাপান-ইটালীর জোট ভেঙ্গে দেবার-জন্য সে চেষ্টা করে। জার্ম্মানীর সঙ্গে সে ভাব রেখে চল্‌তে চেয়েছিল। গত ১৯৩৫ সালে উভয়ের মধ্যে নৌ-চুক্তিও ঠিক করা হ'ল এই জন্য। কিন্তু হিটলার ব্রিটেনের অনুকূল মনোভাবের সুযোগ নিয়ে নিজ শক্তি বাড়িয়েই নিয়েছিলেন। ব্রিটেন পরে ফিরে ইটালীর দিকে। ব্রিটেন ও ইটালীতে কত যুগ যুগান্তের প্রীতির সম্বন্ধ। তুচ্ছ আবিসিনিয়া ও স্পেন নিয়ে কি এ সম্বন্ধ বাতিল করা চলে ? প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন মুসোলিনীর সঙ্গে সন্ধি করতে ব্যগ্র হলেন। ১৯৩৮ সালের নবেম্বর মাসে উভয়ের ভিতর সন্ধি হয়। তখন ব্রিটেন ইটালীর আবিসিনিয়া বিজয় স্বীকার করে, আর ভূমধ্যসাগরে ও লোহিতসাগরে তার অধিকারও মেনে নেয়!

এই সময়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্স একযোগেই স্পেনের উপর ফ্রাঙ্কোর কর্ত্তৃত্ব মেনে নিলে।

এর পর একটা বিশ্রী রকম ব্যাপার ঘট্‌ল। তা হ'ল হিটলার কর্ত্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়ার বোহিমিয়া ও মোরাভিয়া গ্রাস! হিটলারের উদ্দেশ্য বুঝতে ব্রিটিশ ধুরন্ধরদের তখন আর বাকি রইল না। ব্রিটেন অতঃপর ফ্রান্সের সহযোগে সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা করতে চাইলে। কিন্তু এ-ও সম্ভব হয় নি, তোমরা আগেই তা জান্‌তে পেরেছ। সোভিয়েট-জার্ম্মান মিতালীর পরই হিটলার পোল্যাণ্ডের ঘাড়ে এসে চেপে বস্‌লেন। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন, পোল্যাণ্ডকে একবার আত্মসাৎ করতে পারলে অন্যান্য বারের মত এবারেও ব্রিটেন তার সঙ্গে একটা রফা করে ফেলবে। কিন্তু ব্রিটেন পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ফ্রান্সের সহযোগে এর আগেই তার সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হয়েছিল। তাই সে-ও জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে অবিলম্বে যুদ্ধ ঘোষণা করলে। আয়ার্লণ্ড ছাড়া, অন্যান্য ডোমিনিয়ান-গুলিও তার মতে মত দিয়েছে। ভারতবর্ষের কথা আগেই তোমাদের বলেছি।

যুদ্ধারম্ভের দিন পনরর ভিতরেই পোল্যাণ্ডের পতন হয় এবং জার্ম্মানী ও রুশিয়া তাকে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়, তোমাদের আগে এ সব বলা হয়েছে। এ সময় থেকে জার্ম্মান ইউ-বোটের আক্রমণে ব্রিটিশের বহু রণতরী ও মালবাহী জাহাজ

জলমগ্ন হয়। আকাশে জার্ম্মান বিমানপোত থেকে ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন ও বিভিন্ন শহরের উপর অবিশ্রান্ত বোমা বর্ষণ হতে থাকে। ফ্রান্স ও ব্রিটেন একযোগে জার্ম্মানীর উপর কিছু কিছু বোমা ফেলে বটে, কিন্তু তখন তা বিশেষ কার্য্যকর হয় নি। পোল্যাণ্ড অধিকারের কয়েক মাস পরে জার্ম্মানী উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের রাজ্যগুলি আক্রমণ করে। উত্তরে নরওয়েতে এই অভিযানের আরম্ভ আর ফ্রান্সের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এর শেষ। এর প্রত্যেক স্থলে ব্রিটিশবাহিনী জার্ম্মানদের বাধা দিতে চেষ্টা করেছে। কোন কোন স্থলে যেমন ফ্লাণ্ডার্সে—ব্রিটিশবাহিনী সমূলে ধ্বংস হবারও উপক্রম হয়, কিন্তু অদ্ভুত কৌশলের সঙ্গে তারা সরে পড়্‌তে সক্ষম হয়েছে। ফ্লাণ্ডার্স থেকে চলে আসাকে ইংরেজরাই আখ্যা দিয়েছে 'heroic flight' বা বীরত্বপূর্ণ পলায়ন! এখানে তোমাদের বলে রাখি যে, নরওয়ের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই নেভিল চেম্বারলেন প্রধান মন্ত্রীর পদ হতে অবসৃত হন। তারপর মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিল হলেন ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী। সেখানে একটি ওয়ার কেবিনেট বা যুদ্ধ-মন্ত্রীসভা গঠিত হয় এবং তাদের নির্দ্দেশই যুদ্ধকার্য্য পরিচালিত হতে থাকে! চেম্বারলেন মন্ত্রিত্ব ত্যাগের অল্প দিন পরেই মারা যান।

ইটালী মিত্রশক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেই উত্তর-পূর্ব্ব আফ্রিকায় ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ড দখল করে ও লোহিত সাগরের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। চার্চ্চিল রাষ্ট্রের নেতৃত্ব গ্রহণ

করার পর ব্রিটিশবাহিনীতে কতকটা আশার সঞ্চার হয়। ১৯৪০ সালের শেষদিকে উত্তর-পূর্ব্ব আফ্রিকার হৃতরাজ্য এখানকার ব্রিটিশ সেনানী উদ্ধার করে এবং আবিসিনিয়া, এরিট্রিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ইটালী-বাহিনীকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী করে। উত্তর আফ্রিকার লিবিয়াতেও ব্রিটিশ-বাহিনী বহুদূর অগ্রসর হয়। ব্রিটিশ-সরকার আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রে পূর্ব্ব সম্রাট হাইলে সেলাসিকে এর কর্ত্তৃত্ব ভার অর্পণ করেন।

ব্রিটেনের প্রধান লক্ষ্য হিটলার। ফ্রান্সের পতনের পর থেকে ইংলণ্ডের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলেই শুধু বোমা বর্ষিত হয় নি, হিটলারের নির্দ্দেশে অ-সামরিক অঞ্চলে—জনপদে ও শহরে বোমা বর্ষিত হয় ও বহু অমূল্য সম্পদ বিনষ্ট হয়। উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপে নিজ আধিপত্য বিস্তার করে হিটলার পূর্ব্ব এবং পূর্ব্ব-দক্ষিণ ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির উপর নজর দেন। এ সব অঞ্চলে আগেই যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস ও তুরস্ক ছাড়া প্রত্যেকেই তাঁর প্রাধান্য মেনে নেয়। তুরস্ক নিরপেক্ষ রাষ্ট্র, তাঁর উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হয় নি। যুগোশ্লাভিয়া প্রথমে হিটলারের হুমকি মেনে চল্‌তে রাজি হয়। কিন্তু একদিন অকস্মাৎ সে তার স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে। ব্রিটেনের পরামর্শেই সে এরূপ করেছিল। জার্ম্মানীর সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ সোভিয়েট-রুশিয়াও কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্য-প্রয়াসী যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে একটি অনাক্রমণাত্মক চুক্তি করে বসে। জার্ম্মান-বাহিনী এর পরই যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণ করে ও

কয়েকদিনের মধ্যেই এ রাজ্যটি দখল করে ফেলে। গ্রীসও ব্রিটেনের বন্ধু। যুগোশ্লাভিয়ার পতনের পরই হিটলারের গ্রীক অভিযান আরম্ভ হয়। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীও গ্রীসের সাহায্যার্থ প্রেরিত হ'ল। কিন্তু অন্যান্য স্থলের মত এখান থেকেও তারা হটে আস্‌তে বাধ্য হয়। গ্রীস থেকে ক্রীট দ্বীপে এসে তারা আশ্রয় নিয়েছিল, কিন্তু জার্ম্মান-বাহিনীর অদ্ভুত রণকৌশলে এখান থেকেও তাদের অবিলম্বে চলে আস্‌তে হয়। তোমরা আগেই জেনেছ, গ্রীকরা ইটালীর সেনাবাহিনীকে এর পূর্ব্বে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিল। গ্রীকরা বীর যোদ্ধা বটে, কিন্তু জার্ম্মান-বাহিনীর শ্রেষ্ঠতর রণশক্তির সম্মুখে তারা দাঁড়াতে পারে নি।

ইটালীর হৃতশক্তি ফিরিয়ে আনবার জন্য উত্তর আফ্রিকার লিবিয়াতেও একটি জার্ম্মান-বাহিনী প্রেরিত হয়। সেখানে তারা মিত্রশক্তি-বাহিনীকে প্রথমে হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়। পরে মিত্রসেনারা আবার পূর্ব্ব অধিকৃত কোন কোন স্থল দখল করে। এখানে সেনাপতি রোমেলের নেতৃত্বে জার্ম্মান-বাহিনী যুদ্ধ করে। ১৯৪২ সালে জার্ম্মান-বাহিনী মিশরের অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে আলেকজাণ্ড্রিয়ার অল্প দূরে এসে পৌঁছায়। মিত্রশক্তিবর্গ শত্রুকে সার্থক ভাবে বাধা দেবার জন্য সকল রকম আয়োজন করে।

ইতিমধ্যে গ্রীস বিজয়ের পর এক মাস যেতে না যেতেই

জার্ম্মান সেনা সোভিয়েট রুশিয়াকে আক্রমণ করে ও একই সময়ে আঠার শ' মাইল ব্যাপী রণক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনা সুরু হয়। জার্ম্মানীর সঙ্গে সোভিয়েট রুশিয়ার সন্ধি যেমন বিশ্ববাসীকে হকচকিয়ে দিয়েছিল, এই সংগ্রাম আরম্ভেও তেমনি লোকের বিস্ময়ের অবধি রইল না। এই উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ ঘটাবার জন্য ইংরেজের কূটনীতি যে অত্যধিক সক্রিয় হয়ে উঠেছিল তা বুঝতে কারোই বেশী বিলম্ব হ'ল না। সন্ধিবদ্ধ হলেও, জার্ম্মানী ও সোভিয়েট রুশিয়ার মধ্যে বিশেষ সম্প্রীতি স্থাপিত হয় নি। ইউরোপে জার্ম্মানীর বিজয়-অভিযান রুশিয়া ভাল চোখে দেখে নি। উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব্ব-দক্ষিণ ইউরোপে আধিপত্য বিস্তার করে ইংলণ্ড আক্রমণের সঙ্কল্প ছিল হিটলারের, কিন্তু ইতিমধ্যেই সোভিয়েট রুশিয়ার কার্য্যকলাপে তার উপর তাঁর এই সন্দেহ জন্মে যে, ব্রিটেন-অভিযান আরম্ভ হলেই রুশিয়া হয়ত পিছন থেকে জার্ম্মানীকে আক্রমণ করবে। যে কারণেই হোক, যুদ্ধ যখন বাধল তখন কালবিলম্ব না করে সোভিয়েট রুশিয়া ও ব্রিটেন পরস্পর সাহায্যমূলক চুক্তিতে আবদ্ধ হ'ল ও ব্রিটিশ সরকার রুশিয়ায় রসদ-পত্র পাঠাতে আরম্ভ করলে।

তোমরা ইতিপূর্ব্বে জেনেছ যে, জার্ম্মানী এবং ইটালীর সঙ্গে জাপান এই যুদ্ধের মধ্যেই একটা সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। তার এই কার্য্য ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট মোটেই

ভাল ঠেকে নি। কিছুকাল যাবৎ এদের মধ্যে নানা ভাবে মনকষাকষি চল্‌তে থাকে। পরে ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর কাউকে কিছু না জানিয়ে জাপান অকস্মাৎ ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং প্রশান্ত মহাসাগরে উভয়ের রাজ্যই যুগপৎ আক্রমণ করে। পাঁচ-ছ' মাসের মধ্যে বিস্তর ভূখণ্ড জাপান অধিকার ক'রে নেয়। এর ভিতরে ব্রিটেনের অধিকৃত মালয়, সিঙ্গাপুর, ব্রহ্মদেশ ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জও ছিল। পরে জাপান-বাহিনী বঙ্গদেশ ও আসামের সীমান্তে উপনীত হয়।

চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রুশিয়া, গ্রেট ব্রিটেন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ নিয়েই মিত্রশক্তিবর্গ। এদের মধ্যে রুশিয়া, নিজ রাজ্য রক্ষায়ই ব্যস্ত। এশিয়া, আফ্রিকা, ও পশ্চিম ইউরোপে অন্যান্য মিত্রশক্তি জার্ম্মানী ও জাপানকে বাধা দিতে অগ্রসর হয়। ভারতবর্ষে জাপানী অভিযান প্রতিরোধের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাহিনী, মার্কিন সেনা ও রণসম্ভার বিস্তর আমদানী করা হয়। পশ্চিম ইউরোপে একটি দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার জন্যও মিত্রশক্তিবর্গ সচেষ্ট হন এবং ফরাসী উপকূলে তাদের সঙ্গে জার্ম্মান-বাহিনীর একটি প্রারম্ভিক সংঘর্ষও ঘটে। ব্রিটিশ বিমানবহর বহুদিন যাবৎ জার্ম্মানীর অভ্যন্তরে ও জার্ম্মান-অধিকৃত ভূখণ্ডে বোমা বর্ষণ করেছিল। শত্রুর সমরোপ্‌করণ-নির্ম্মাণ কারখানাগুলির এতে বিশেষ ক্ষতি সাধিত হয়।

ব্রিটেন মিত্রশক্তিবর্গের সঙ্গে একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে অক্ষ-শক্তিদের বিরুদ্ধে রণে লিপ্ত থাকে। শত্রুকে হীনবল করার জন্য তারও সমস্ত শক্তি নিয়োজিত। তোমরা শুনলে আশ্চর্য্য হবে, সমরোপকরণ নির্ম্মাণে ও যুদ্ধ-পরিচালনে ব্রিটেনের প্রতিদিন ব্যয় হয় ষোল কোটি পাউণ্ড! জাহাজ-ডুবিতে তার বিস্তর ক্ষতি হয়েছে। ফ্রান্সের পতনের পর ব্রিটেনের উপকূলে ও সাম্রাজ্যের অন্যত্র বহু ফরাসী জাহাজ ব্রিটেন আটক করে রাখে। প্রয়োজন মত সে তা ব্যবহারও করে। সামরিক প্রয়োজনে দক্ষিণ আফ্রিকার নিকটবর্ত্তী ফরাসী উপনিবেশ মাদাগাস্কার দ্বীপও ব্রিটেন দখল করে নেয়।

আগেই তোমাদের বলেছি, গত ১৯৪৩ সালের আরম্ভেই মিত্রশক্তি-বাহিনী উত্তর-আফ্রিকা থেকে অক্ষ সেনাদল তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়, এবং তারা প্রথমে সিসিলি ও পরে খাস ইটালীতে উভয় পক্ষে ভীষণ লড়াই চলে। পূর্ব্ব ইউরোপে রুশ শক্তির সম্মুখে অক্ষবাহিনী দাঁড়াতে না পেরে পশ্চাদপসরণ করায় ব্রিটিশ ও মার্কিন নেতৃবর্গ ইটালীতে অভিযান চালাতে অধিকতর উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন। ওদিকে প্রাচ্যে জাপান এবং প্রতীচ্যে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে সার্থকভাবে লড়বার জন্য তেহেরানে ও কায়রোতে মিত্রশক্তিবর্গের নেতৃমণ্ডলীর মধ্যে দু-দু'বার শলা-পরামর্শ হয়।

১৯৪৪ সাল থেকে যুদ্ধের আকার কিরূপ ভীষণতর হয়,

ব্রিটেন

ইতিপূর্ব্বে তোমরা তা জেনে নিয়েছ। মিত্রশক্তি কর্তৃক ফ্রান্সে অবতরণ এবং পশ্চিম প্রান্ত থেকে জার্ম্মানীর অভ্যন্তরে প্রবেশ, সোভিয়েট রুশিয়া কর্তৃক পোল্যাণ্ড অতিক্রম করে রাজধানী বার্লিন আক্রমণ ও অবরোধ, জার্ম্মানীর পতন, হিটলার মুসোলিনীর জীবনান্ত প্রভৃতি তোমাদের বলেছি। জার্ম্মানীর পতনের প্রাক্কালেই ক্যালিফর্নিয়ার প্রধান সহর সান ফ্রান্সিস্কোতে মিত্রপক্ষীয় পঞ্চাশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ সম্মিলিত হয়ে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ও জগতে স্থায়ী শান্তি স্থাপন কল্পে আলাপ-আলোচনা করেছেন এবং কতকগুলি বিষয়ে ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করে ফেলেছেন। সোভিয়েট রুশিয়া পরাধীন রাজ্যগুলির প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হলেও ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতির মতানুসারেই চলতে স্বীকৃত হয়েছে। বার্লিনের পটস্‌ডামে জার্ম্মানীর ভাগবণ্টন সম্পর্কে ত্রিশক্তি বৈঠকে ব্রিটেন এক প্রধান পক্ষ, অন্য পক্ষত্রয় হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রুশিয়া ও ফ্রান্স। ইতিমধ্যে ব্রিটেনে সাধারণ নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দলের পরাজয় ঘটেছে, এবং শ্রমিকদল সংখ্যাধিক্য হেতু মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছে। এখন ক্লেমেণ্ট এটলী প্রধান মন্ত্রী। অনেকে মনে করেন, শ্রমিক দলের হস্তে গবর্ণমেণ্ট ন্যস্ত হওয়ায় জগতে অতি দ্রুত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হবে। ইতিমধ্যেই জাপানের পতন হয়েছে।

—তিন—

সোভিয়েট রুশিয়া

আগেই তোমাদের একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন মনে করি। সোভিয়েট রুশিয়াও একটি গণতন্ত্র, তবে ফ্রান্স বা ব্রিটেনকে আমরা যে ধরণের গণতন্ত্র বলে থাকি এ কিন্তু সে ধরণের নয়। আমরা যে শ্রেণীর গণতন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত তাতে একাধিক দল থাক্‌বে, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রীসভা গঠন করে দেশের শাসনকার্য্য পরিচালনা করবে। সোভিয়েট রুশিয়ায় কিন্তু জার্ম্মানীর মতই একটির বেশী দল নেই। যদিও ক' বছর পূর্ব্বে সেখানে একটি নূতন শাসন-তন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়েছে তথাপি একে ও-ধরণের গণতন্ত্র এখন পুরাপুরী বলা চলে না। সেখানে আজও কম্যুনিষ্ট বা সাম্যবাদী দলই দেশ শাসন কর্‌ছে। অন্য কোন দলের অস্তিত্ব এখনও সেখানে স্বীকৃত হয় না। সোভিয়েট রুশিয়ার নাম দেওয়া হয়েছে 'সম্মিলিত স্বাধীন রুশ সোভিয়েট রিপাব্লিক'। পূর্ব্বেকার এগারটি এবং এই যুদ্ধের মধ্যে প্রাপ্ত পাঁচটি—একুনে এই ষোলটি স্বতন্ত্র প্রদেশ নিয়ে বর্ত্তমান রুশ রিপাব্লিক গঠিত। আগেকার এগারটি হ'ল—খাস রুশিয়া, ইউক্রেন, সাদা রুশিয়া, আজার বাইজান্‌, জর্জ্জিয়া, আর্মেনিয়া, তুর্কিস্থান, উজ্‌বেকিস্তান, তাজিকিস্তান, কাজাক,

সোভিয়েট রুশিয়া

খিরঘিজ ; যুদ্ধের মধ্যে লব্ধ এই পাঁচটি—ক্যারেলো-ফিনিশ, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানীয়া, মলদাভিয়া। এগুলি প্রত্যেকে এক একটি স্বতন্ত্র রিপাব্লিক। সোভিয়েট রুশিয়ায় একটি দলের প্রাধান্য হলেও জনসাধারণের মঙ্গলের ভিত্তিতেই এ শাসন প্রতিষ্ঠিত। ধনী, জমিদার, অভিজাত ও পুঁজিদার সব উচ্ছেদ করে, সমাজে ও শাসনে শ্রমিক জন-মজুরের প্রাধান্য স্থাপনই এর মূল লক্ষ্য। গত পঁচিশ বছর পর্য্যন্ত রুশিয়ার কম্যুনিষ্ট বা সাম্যবাদী দলের নেতারা এই উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে এসেছেন। তারা অনেকটা সাফল্যও অর্জ্জন করেছেন।

ফ্রান্স, ব্রিটেন প্রমুখ রাষ্ট্রগুলি প্রথমে একে একেবারে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। পরে যখন দেখ্‌ল একে ধ্বংস করা অসম্ভব তখন এর সঙ্গে নানারকম সন্ধি ও চুক্তি কর্‌তে থাকে। মনে মনে কিন্তু তারা একে ঘৃণাই করত, আর এ থেকে শত হস্ত দূরে থাক্‌তে চেষ্টা করত। কেননা তারা গণতন্ত্র শাসনের ভক্ত হলেও এটা চায় না যে, ধনী ও অভিজাত সমাজ দেশ থেকে লুপ্ত হয়ে যাক্‌। শাসনভার যাদের উপর ন্যস্ত তাদের অধিকাংশই বংশপরম্পরায় পুঁজিদার সমাজ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। কাজেই তারা যে রুশিয়ার নূতন ধরনের গণতন্ত্রের বিরোধী হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

রুশিয়ার সঙ্গে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বিরোধিতা গত দুই যুগের মধ্যে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বে

বোলশেভিকরা রুশিয়ায় রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ক'রে নূতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে। জার্ম্মানীর পতন ও ভের্সাই সন্ধি বিধিবদ্ধ হবার পর মিত্রশক্তিরা রুশিয়ার এই নূতন শাসনতন্ত্র উচ্ছেদ করতে লেগে যায়। কিন্তু রুশ জনসাধারণ তখন নূতন মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়েছে। স্বাধীনতার আস্বাদ তারা পেয়েছে, তাদের মেরুদণ্ডও এর মধ্যে খুবই শক্ত হয়ে গেছে। ব্রিটিশ, ফরাসী, ইটালিয়ান, পোল, চেক, জাপানী, বিদ্রোহী সাদা রুশ চারদিক থেকে তাকে আক্রমণ করলে। কিন্তু ট্রট্স্কি নামে আর একজন প্রধান বোলশেভিক নেতা জাতীয় সেনাদলকে নিপুণভাবে পরিচালনা করে সকলকেই একে একে হটিয়ে দিতে সক্ষম হন।

একদিকে যখন শত্রু বিতাড়ন কার্য্য চল্‌ল, অন্যদিকে তখন লেনিন শাসন-কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করতে লাগ্‌লেন। তিনি যে নীতির দোহাই দিয়ে জয়লাভ করেছেন তার নাম সাম্যবাদ। মানুষের ধনগত বৈষম্য লোপ করে সকলকে এক শ্রমিক পর্য্যায়ে ফেলতে হবে—সাম্যবাদের এই হ'ল মূল কথা। লেনিন শাসন-ভার হাতে নিয়ে দেখ্‌লেন, এ উদ্দেশ্য এক দিনে সিদ্ধ হবার নয়। তাই তিনি ধনিক ও জমিদার অভিজাতদের উচ্ছেদ করে দিয়েও ভূমি একেবারে সরকারে বাজেয়াপ্ত করলেন না, কিছু সরকারের হাতে রেখে বেশীর ভাগই জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। রুশিয়ায় মধ্যবিত্ত কৃষক সম্প্রদায়ের নাম 'কুলক'। তাদের গায়ে তিনি হাত দিলেন না। দেশের

সর্ব্বপ্রকার খনিজ ও ভূমিজ সম্পদ সুনিয়ন্ত্রিত করবার জন্য একটা পরিকল্পনা অনুসারে কাজ আরম্ভ করলেন। তিনি এ পরিকল্পনার নাম দিলেন 'নিউ ইকনমিক পলিসি' (সংক্ষেপে N. E. P.) বা নূতন আর্থিক সংস্থা। ১৯২৪ সালের আরম্ভেই লেনিন মারা গেলেন। তাঁর অন্যতম যোগ্য সহচর ষ্টালিনের উপরই সব দায়িত্ব পতিত হ'ল। ট্রট্‌স্‌কি ছিলেন লেনিনের দক্ষিণহস্ত। অনেকে ভেবেছিলেন, লেনিনের পর ট্রট্‌স্‌কিই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন। কিন্তু ট্রট্‌স্‌কি তা হতে পারেন নি, ষ্টালিনই হয়েছেন। ট্রট্‌স্‌কি ও ষ্টালিনের ভিতর বিরোধ অনেক দূর গড়িয়েছিল। ট্রট্‌স্‌কি দেশত্যাগী হয়ে নানা দেশ ঘুরে শেষে মেক্সিকোতে গিয়ে আশ্রয় নেন। তিনি একজন বিরাট্‌-পুরুষ ছিলেন। ১৯৪০ সালে তিনি আততায়ীর হস্তে নিহত হন।

ষ্টালিনের সঙ্গে ট্রট্‌স্‌কির বিরোধ কোথায় তার আভাষ তোমাদের দিয়ে রাখছি। লেনিন যা চেয়েছিলেন, ট্রট্‌স্‌কি ষ্টালিনও তাই চান,—জগতের সর্ব্বত্র সাম্যের ভিত্তিতে গণ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হোক। কিন্তু উপায় সম্বন্ধে এঁদের ভিতর গুরুতর মতভেদ দেখা দেয়। ট্রট্‌স্‌কি বলেন, এ প্রথা এখনই সর্ব্বত্র চালাতে হবে, নইলে রুশিয়ায় এ দৃঢ় ও পাকা হবে না। ষ্টালিন বলেন, তা নয়, প্রথমে রুশিয়ার সাম্য-শাসন সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করা দরকার, তবেই অন্যত্র একে শীঘ্র শীঘ্র প্রবর্ত্তিত করা যাবে। লেনিনেরও নাকি এই মত ছিল। এ কারণ ষ্টালিন একে একটি

সাম্যমূলক গণতন্ত্রে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর হন। ষ্টালিন দু-দুবার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করেছেন। প্রথম বারের মেয়াদ শেষ হয় বিগত ১৯৩২ সালে, আর দ্বিতীয়টী শেষ হয় ১৯৩৭ সালে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে ও সমবায় রীতিতে ভূমির খনিজ দ্রব্য আহরণ, শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা, সর্ব্বত্র বিদ্যুৎশক্তির প্রচলন, রাস্তাঘাট ও রেলপথ বিস্তার, ব্যাপকভাবে শিক্ষা প্রবর্ত্তন ও বেকার সমস্যার সমাধান—এ বিষয়গুলি ছিল প্রথম পরিকল্পনার অঙ্গ। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঁচ বছর খুব কাজ চলে! এর সাফল্য সম্বন্ধে কিন্তু অনেক মতভেদ আছে। তবে কাজ যে দ্রুত অগ্রসর হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এ পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করতে গিয়ে শস্য উৎপাদনে অনেক ব্যাঘাত ঘটল। আর ব্যাঘাত ঘটাবার মূলে ছিল রুশিয়ার কুলক সম্প্রদায়। তারা নূতন ব্যবস্থা মোটেই পছন্দ করে নি। কাজেই তারা ইচ্ছা করেই আশানুরূপ শস্য জন্মালে না। ফলে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া চারদিক ছেয়ে ফেললে। দ্বিতীয় বার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে কাজ সুরু হলে ষ্টালিন এর শোধ তুললেন। তিনি প্রায় আড়াই লক্ষ কুলককে সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসনে পাঠিয়ে এদের মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙ্গে দিলেন! দ্বিতীয় বার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ ফুরোলে দেখা গেল এবারে রুশিয়া আশ্চর্য্যরকম উন্নতি করেছে।

সোভিয়েট রুশিয়া

রুশিয়ার ধনসম্পদ অফুরন্ত। সেখানে বেকার একজনও নেই। শতকরা নব্বই জন শিক্ষিত। সংবাদপত্র ও তার পাঠক আজ রুশিয়ায় অগণিত। থিয়েটার, রেডিও বায়োস্কোপের আয়োজন খুবই সেখানে। আর এ সবই সরকার থেকে করা হয়েছে। ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত, বা সম্প্রদায়গত স্বার্থ সেখানে কিছুই নেই।

বিজ্ঞানেও রুশিয়া খুবই উন্নতি করছে। বহু বৈজ্ঞানিকের সমাবেশ হয়েছে সেখানে। ষ্টালিন বড় বড় বৈজ্ঞানিক নিযুক্ত করেছেন সুমেরু আবিষ্কারের জন্য। সুমেরু বরফের দেশ, সেখানে বরফ ছাড়া আর যে কিছু থাক্‌তে পারে তা কেউ কল্পনাও করে নি। রুশ বৈজ্ঞানিকেরা কয়লাখনি ও স্বর্ণখনিও সেখানে আবিষ্কার করেছেন! এর পরিমাণও নাকি বিস্তর। বরফ সরিয়ে কৃষিকাজও সেখানে করা চল্‌বে!

সদ্যগত দ্বিতীয় মহাসমরে রুশ বৈজ্ঞানিকগণ পশ্চাতে থেকে দেশরক্ষার আয়োজনে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। সম্প্রতি রুশিয়ার বিজ্ঞান-সভার দু'শ কুড়ি বৎসর পূর্ত্তি উপলক্ষে এক বিশেষ উৎসব হয়ে গেছে। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের সেরা বৈজ্ঞানিকরা এই উৎসবে যোগদান করেন। ভারতবর্ষ থেকে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন ডক্টর মেঘনাদ সাহা। তিনি সেখান থেকে ফিরে এসে রুশিয়ার পুনর্গঠনে বৈজ্ঞানিকদের অদ্ভুত কৃতিত্বের কথা বিশদ ভাবে ব্যক্ত করেছেন।

গোড়াতেই রুশিয়ার নূতন শাসনতন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছি। এতকাল রুশিয়ায় রিপাব্লিক বা গণতন্ত্রের নামে কম্যুনিষ্ট পার্টি বা সাম্যবাদী দল দেশ শাসন করত। ষ্টালিন দীর্ঘকাল দলের জেনারেল-সেক্রেটারী বা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তাঁর হাতেই কিন্তু দেশ-শাসনের চাবি কাঠি! প্রায় বিশ বছর ধরে সাম্যবাদের আদর্শে সতর কোটি রুশ পরিচালিত হয়েছে! এদের ভিতর উন্নত শিক্ষিত সভ্য থেকে আরম্ভ করে আদিম যুগের মানুষও বিস্তর রয়েছে। সাম্যবাদের আদর্শেই কিন্তু এরা সকলে পরিচালিত। যখন দেখা গেল, এসমুদয়ের হাতে শাসন-ভার অর্পিত হলে আদর্শচ্যুত হবার আশঙ্কা নেই তখন গণতন্ত্রমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা সুরু হয়।

সোভিয়েট কংগ্রেসে অনেক আলোচনা ও বিতর্কের পর গত ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে সাম্যবাদের আদর্শে গণতন্ত্র-শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যবস্থার নাম দেওয়া হয় 'ষ্টালিন কনষ্টিটিউশন'। কারণ এর ভিতরে ষ্টালিনের হাত ছিল যথেষ্ট। শাসনতন্ত্রের প্রথম দফাতেই বলা হয়েছে, "সোভিয়েট রুশিয়া একটি শ্রমিক ও কৃষকের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র"। কাজেই দেখতে পাচ্ছ শ্রমিক ও কৃষক ছাড়া অন্য কারুর স্থান এতে নেই। সমগ্র দেশের উপর যে পার্লামেণ্ট গঠিত তাতে প্রতি তিন লক্ষ লোকের একজন করে প্রতিনিধি থাক্‌বার ব্যবস্থা হয়েছে। এর উপর একটা উচ্চতন পরিষদ আছে। রিপাব্লিক

ছাড়া কয়েকটি স্বায়ত্ত-শাসনসম্পন্ন রাষ্ট্রও এখানে রয়েছে। প্রত্যেক রিপাব্লিক ও স্বায়ত্ত-শাসনসম্পন্ন অঞ্চল থেকে এখানে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সভ্য পাঠানো হয়। আইন-কানুন বিধিবদ্ধ করবার ও দেশ-শাসনের ভার এখনও মন্ত্রীসভারই উপর। মন্ত্রীসভার নাম হ'ল 'কাউন্সিল অফ্ দি পিপ্ল্স্ কমিসার'। একে কিন্তু এখনও কম্যুনিষ্ট পার্টির নিকটেই জবাবদিহি করতে হয়। বর্ত্তমানে গণতন্ত্রমূলক শাসন সুরু হলেও রুশিয়া আজও ষ্টালিনের নির্দ্দেশেই চল্‌ছে।

কে মিত্র কে শত্রু নেতারা অনেক আগেই তা জানতে পেরেছিলেন। জগতের প্রায় সব দেশই তাঁদের উপর খাপ্পা, সাম্যবাদমূলক শাসন সেখানে চালু হয়েছে ব'লে। এজন্য অনেক আগে থেকেই দেশ-রক্ষার আয়োজন তাঁরা সুরু করে দিয়েছিলেন। রুশিয়ার সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। আজ কোটি কোটি লোক সেখানে যুদ্ধবিদ্যা জানে! বিমানপোতও তার বিস্তর। চারদিকেই তার শত্রু। এজন্য দ্রুত সৈন্য চলাচলের জন্য নূতন ধরণের 'ডবল ট্র্যাক' বা সমান্তরাল ভাবে দুটি রেলপথও নির্ম্মাণ করা হয় সাইবেরিয়ার দিকে। নূতন ব্যূহও এখানে তৈরী হয়েছে। স্থলসৈন্য, বিমানপোত ও নৌবহর বিস্তর মজুত আছে। ষ্টালিন মত-বৈষম্যের জন্য অনেকগুলি বড় বড় সেনাধ্যক্ষকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। বিচারে কারো কারো মৃত্যুদণ্ড হয়, কারো কারো বা হয়

দীর্ঘকালের জন্য নির্ব্বাসন। কেউ কেউ বলেন, রুশিয়ার সামরিক শক্তি এতে অনেকটা ব্যাহত হয়েছে। ষ্টালিন কিন্তু বলেন, এ কথার ভিতর সত্য এতটুকুও নেই।

রুশিয়ার উপর জগতের অধিকাংশ রাষ্ট্রই কেন বিরূপ হয়েছে আগে বলেছি। ব্রিটেন ও ফ্রান্স গণতন্ত্র হলেও পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বৈ তো নয়! কাজেই তারাও কম বিরূপ ছিল না তার উপর। বিপ্লবের অবসান হ'লে রুশিয়া যখন চারদিকে তারা আদর্শ প্রচার করতে সুরু করে তখন ব্রিটেনই তাকে বিশেষভাবে বাধা দেয়। ইটালী জার্ম্মানী ও মধ্য-ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের ভিতরে সাম্যবাদ যে প্রচলিত হয় নি তা প্রধানতঃ এই ব্রিটেনেরই চেষ্টায় বল্‌তে হবে। ভারতবর্ষেও এক সময়ে সাম্যবাদ মাথা তুলতে চেয়েছিল। এখানকার গবর্ণমেণ্ট তা অঙ্কুরেই বিনাশ করে দেয়। ষ্টালিনের আমলে রুশিয়া যখন আস্তে আস্তে পররাজ্য-প্রবেশ নীতি পরিহার করলে, ব্রিটেন তখন কতকটা আশ্বস্ত হ'ল। কিন্তু এ যে আবার মাথা তুলে উঠ্‌বে না—তার কি নিশ্চয়তা আছে? তাই ভবিষ্যতেও একে বাধা দেবার জন্য সে ইটালী থেকে জার্ম্মানী পর্য্যন্ত একটি পাচিল তুলে রাখ্‌তে চেয়েছিল। জার্ম্মানী ও ইটালী রুশিয়াকে সর্ব্বপ্রকারে বাধা দেবার অছিলায় রণসম্ভারও যদৃচ্ছ বাড়িয়ে নেয় এসময় থেকে।

সোভিয়েট রুশিয়ার পররাষ্ট্র-নীতি সম্বন্ধেও তোমাদের জেনে রাখা দরকার। বিপ্লবের পরে রুশিয়া মাঝে মাঝে কোন-

না কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি ও সন্ধি করে, কিন্তু বিশ্ব-দরবারে সে আসন পেল গত ১৯৩৪ সালের শেষের দিকে রাষ্ট্রসংঘে প্রবেশ করে। পররাষ্ট্র-নীতিতে তার দক্ষতা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় এ সময়। ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রমুখ রাষ্ট্রসংঘের সভ্যগণকে তখন থেকে সে প্রত্যয় করাতে চেষ্টা করে যে, অন্য দেশে সাম্যবাদমূলক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ইচ্ছা সে ত্যাগ করেছে। এর পরেই সে ফ্রান্সের সঙ্গে ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট চুক্তি করে। জাপ-জার্ম্মান চুক্তি কিন্তু এই চুক্তিরই জবাব বলে অনেকে মনে করেন। জাপ-জার্ম্মান চুক্তির কথা তোমাদের পরে বলব। রাষ্ট্রসংঘে ইটালীর বিরুদ্ধে আর্থিক শাস্তি-দানের যে ব্যবস্থা হয় তার জন্যও সোভিয়েট কম দায়ী ছিল না।

রুশিয়ায় সাম্য-বাদমূলক শাসন স্থাপিত হলেও জাতীয় স্বার্থ সোভিয়েট অন্য কারো চেয়ে কিন্তু কম করে দেখে না। যখন ইটালীর নিকট তৈল বিক্রয় বন্ধ করবার প্রস্তাব হ'ল তখন অন্যান্যের সঙ্গে সে-ও এতে আপত্তি জানালে। তৈল যে রুশিয়ার একটি বড় সম্পদ ; বিক্রি বন্ধ হয়ে গেলে ভয়ানক আর্থিক ক্ষতি হবে তার। অথচ একমাত্র এই কারণেই সমস্ত শাস্তি-দান ব্যবস্থা অকেজো হয়ে যায়। আধুনিক যুদ্ধে তৈল না হলে চলে না। তৈল না পেলে ইটালী বাধ্য হয়ে যুদ্ধ বন্ধ করত, আবিসিনিয়ার ভাগ্যবিপর্য্যয় হ'ত না, ইটালী-জার্ম্মানীতে

বন্ধুত্বও পাকা হ'ত না, জগতের রাষ্ট্র-নীতির গতিও হয়ত বদলে যেত।

ওদিকে সমাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্পেনে বিদ্রোহ আরম্ভ হ'ল। ইটালী ও জার্ম্মানী সাম্যবাদকে বাধা দিবার অছিলা করে বিদ্রোহীদের সাহায্য করতে লাগল। সোভিয়েট রুশিয়া প্রথম প্রথম গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করলে বটে, কিন্তু শেষে দেখা গেল সে সরে দাঁড়িয়েছে! এ দ্বারাও বুঝা গেল যে, সে জাতীয়তাকেই বড় করে দেখছে।

এর পর সোভিয়েট রুশিয়া বাইরের ব্যাপারে যেন আর লিপ্ত হতে চায় নি। চীন-জাপান সংঘর্ষেও তাই প্রমাণিত হয়। সোভিয়েট কিন্তু এই সংঘর্ষের আরম্ভেই চীনের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় সম্পর্কে একটা চুক্তি করে। একেবারে ব্যবসামূলক চুক্তি, 'ফেল কড়ি, মাখ তেল' গোছের! চেকোশ্লোভাকিয়াকে রক্ষার জন্য রাষ্ট্রসংঘের সব সভ্যই দায়ী ছিল। কিন্তু ফ্রান্স ও সোভিয়েট রুশিয়া তার সঙ্গে আলাদা সন্ধি করে এ দায়িত্ব-ভার বেশী করে ঘাড়ে নিয়েছিল। চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপার থেকে আর একটা বিষয় কিন্তু স্পষ্ট করে বুঝা গেল,— সাম্রাজ্যবাদীরা তখনও সোভিয়েট রুশিয়ার উপর আস্থা স্থাপন করতে পারে নি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্স কাজ করলে প্রথম থেকেই ইটালী ও জার্ম্মানীকে বাগ মানানো

যেত। কিন্তু শেষে তাদের নিজ নিজ দেশেই হয়ত সাম্যবাদ মাথা নাড়া দিয়ে উঠবে—এ ছিল তাদের আশঙ্কা! মিউনিক চুক্তির সময় তাই তাকে একঘরে করেই রাখা হ'ল। পরে কিন্তু আবার রুশিয়াকেই তোয়াজ করতে ব্রিটেন লেগে যায়। এর ফলাফল—অকস্মাৎ সোভিয়েট-জার্ম্মান চুক্তি ও পোল্যাণ্ড-বণ্টনের কথা তোমরা আগেই জেনে নিয়েছ।

সোভিয়েট-জার্ম্মান মিতালীর ফলে উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপের ছোট দেশগুলিও সন্ত্রস্ত হয়। লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া ও এস্তোনিয়া রুশিয়ার জন্য সৈন্যঘাঁটি, বিমানঘাঁটি ও নৌঘাঁটির স্থান করে দিতে বাধ্য হয়! পরে এগুলি সে আত্মস্থ করে নিয়েছে। ফিনল্যাণ্ডের নিকটেও রুশিয়া এই রকম দাবি জানায়। কিন্তু সে তাতে সম্মত না হওয়ায় উভয়ের মধ্যে মারাত্মক সংঘর্ষ সুরু হয়েছিল। শেষে অবশ্য রুশিয়ার দাবী মেনে নিয়ে তাকে একটি অংশ ছেড়ে দিতে হয়।

যা'হোক রুশ-জার্ম্মান সন্ধির পর মাত্র দু' বছরের মধ্যেই ১৯৪১ সালের ২২শে জুলাই এর উভয় রাষ্ট্রই পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত হ'ল। সোভিয়েট রুশিয়া ও নাৎসী জার্ম্মানীর মধ্যে কখনো তেমন সম্প্রীতি স্থাপিত হয় নি। ইউরোপে হিটলারের বিজয়-অভিযান রুশ-রাষ্ট্র-নেতাদের মনে আতঙ্কের সঞ্চার করে। তাদের এই শঙ্কিত

মনোভাবের সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ কূটনীতিবিদ্‌রা সোভিয়েট রুশিয়াকে জার্ম্মানীর বিরোধী করে তোলে। হিটলার যে অকস্মাৎ তার বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযান আরম্ভ করে এ-ই তার অন্যতম কারণ বলে জার্ম্মান তরফে বলা হয়েছে। রুশ-নেতারা এরূপ পরিণতির জন্য একরূপ প্রস্তুতই ছিলেন। ষ্টালিনের হস্তে রাষ্ট্র-পরিচালনার চাবিকাঠি থাকলেও তিনি এতকাল সরকারী কোন পদ গ্রহণ করেন নি। তিনি রুশ-জার্ম্মান সংঘর্ষ আরম্ভ হওয়ার মাত্র এক মাস পূর্ব্বে ১৯৪১, মে মাসে সোভিয়েট রুশিয়ার প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন।

আড়াই বছর ধরে উভয়ের মধ্যে ভীষণ সংগ্রাম চলে। যুদ্ধারম্ভের চার মাসের মধ্যেই জার্ম্মান-বাহিনী রুশিয়ার বহু অঞ্চল দখল করে। রুশিয়ার সম্পদ-ভূমি ইউক্রেন জার্ম্মানীর কবলে আসে। লেনিনগ্রাড অবরুদ্ধ হয়। ১৯৪১ সালে প্রচণ্ড শীতের মধ্যে রুশ-বাহিনী শত্রুকে কোন কোন অঞ্চল থেকে সরিয়ে দিতে সমর্থ হয়, কিন্তু এই সাফল্য বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। ১৯৪২ সালে জুন-সেপ্টেম্বর মাসে হিটলার তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে রুশিয়া তৈলের আকর ককেশস অঞ্চলে অভিযান চালায়। সোভিয়েট রাষ্ট্র তখন মরণপণ করে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সে যেরূপভাবে সর্ব্বস্ব দিয়ে একাকীই যুঝতে থাকে তাতে পরাধীন নিপীড়িত লোকদের প্রাণেও তখন বিশেষ আশার সঞ্চার হয়।

সোভিয়েট রুশিয়া

রুশিয়া ব্রিটেনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে মিত্রশক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত হ'ল। ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের রসদপত্র রুশিয়ায় পাঠাতে লাগল। তারা কিন্তু সৈন্য দিয়ে তাকে সাহায্য করে নি। রুশিয়ার বোধ হয় এটা ঈপ্সিতও নয়। তবে পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খেলার জন্য মিত্রশক্তি-বর্গকে সে অবিরত অনুরোধ জানাতে থাকে।

সোভিয়েট রাষ্ট্র মিত্রশক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এতেও সে খানিকটা বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছে। জাপান—ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের ঘোর শত্রু বটে, কিন্তু তার সঙ্গে সোভিয়েট রুশিয়া অনাক্রমণাত্মক চুক্তি করে মিত্রতাই বজায় রেখে চলে! কিছুদিন থেকে জোর গুজব রটেছিল, জাপান মাঞ্চুকুও-রুশ সীমান্তে বিস্তর সৈন্য ও রণসম্ভার জড় করে রুশিয়াকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত। উভয় দেশই কিন্তু তখন এর প্রতিবাদ করে জানায় যে, তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণই রয়েছে। গত বছর ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিল মস্কো গিয়ে ষ্টালিনের সঙ্গে শলাপরামর্শ করেন এবং একটি নূতন চুক্তিতে আবদ্ধ হন। যুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্য করা ছাড়া আর কি গোপন কথা এতে আছে প্রকাশ নেই।

একটু আগেই বলেছি, জার্ম্মানী উত্তরে লেলিনগ্রাড ও পশ্চিমে ককেশস অঞ্চলেরও খানিকটা দখল করে। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই তাকে এসব অঞ্চল থেকে সরে আসতে হয়।

জগৎ কোন্ পথে

এর পরে কতকগুলি ঘটনা অতি দ্রুত ঘটে যায়। রুশিয়া, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তিন কর্ণধার—ষ্টালিন, চার্চ্চিল ও রুশভেল্ট তেহারাণে বসে পরামর্শ করেন কি করে জার্ম্মানীকে শীঘ্র সায়েস্তা করা যাবে। পূর্ব্ব থেকে রুশিয়া আগের চেয়েও ভীষণতর ভাবে জার্ম্মানীর উপর আক্রমণ চালায়, ওদিকে পশ্চিম দিক থেকে ব্রিটিশ ও মার্কিনবাহিনী ফ্রান্সের ভিতর দিয়ে জার্ম্মানীর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এর পর থেকেই সমগ্র জার্ম্মানশক্তি দেশরক্ষায় নিয়োজিত হতে বাধ্য হয়। পরবর্ত্তী ব্যাপার সমূহ পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়েই বর্ণিত হয়েছে। এখন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, জার্ম্মানীর পতন ঘটাতে সোভিয়েট শক্তি যেরূপ কৃতিত্ব দেখিয়েছে এরূপ আর কেউ দেখাতে পারে নি। জার্ম্মানীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে তার দাবি সর্ব্বাগ্রে গ্রাহ্য। বার্লিনের পটস্ডামে ত্রিশক্তির বৈঠকের সিদ্ধান্ত দৃষ্টেই এর কতকটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ইতিমধ্যে সান ফ্রান্সিস্কোতে যে সম্মেলন হয়ে গেছে তাতেও রুশ-প্রভাব অনেকটা অনুভূত হয়েছিল। ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে রুশিয়া গত ৯ই আগষ্ট (১৯৪৫) জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং মাঞ্চুকুও আক্রমণ ক'রে অনেকটা দখল করে বসে। সম্প্রতি জাপানের পতন হয়েছে। এখানে রুশিয়া কোন্ পন্থা অবলম্বন করবে দেখবার বিষয়।
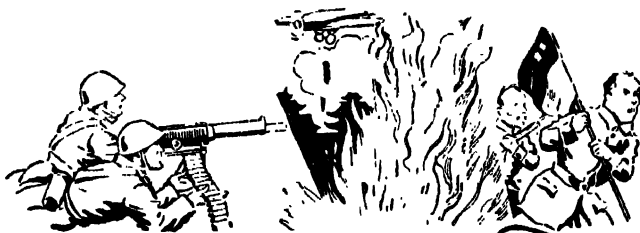
সাম্রাজ্যবাদ ও স্বাধীনতা

—এক—

চীন

ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশের প্রায় অর্দ্ধেকটা জুড়ে রয়েছে সোভিয়েট রুশিয়া। এরই পূর্ব্ব-দক্ষিণে চীন জাপান দুটি দেশ। চীন আবার ভারতবর্ষেরও পূর্ব্ব সীমায় এসে ঠেকেছে। কাজেই সোভিয়েট রুশিয়া ও ভারতবর্ষের সঙ্গে এর সম্পর্ক খুব। চীনের নিজস্ব সভ্যতা বহু প্রাচীন। তথাপি নূতনকে গ্রহণ করতে সে কখনো কার্পণ্য করে নি। ভারতের বৌদ্ধধর্ম্মকে সে এক দিন সাদরে বরণ করে নিয়েছিল। আবার আজকের দিনে রুশিয়ায় যে নব-নীতির পরীক্ষা চল্‌ছে তাকে পরখ করে নিতেও চীনেরা কসুর করে নি। নূতনের প্রতি অনুরাগ তার বহুদিনের। এ অনুরাগ এখনও বজায় আছে।

চীনের কথা বলতে গেলে চীন-জাপান লড়াইয়ের কথাই আগে মনে হয়। এ লড়াই চলে প্রায় ন' বছর। যতই দিন যায় ততই দুটি কথা কিন্তু স্পষ্ট হয়ে পড়ে। চীন তার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবে, স্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে ধরাপৃষ্ঠ হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক্ ক্ষতি নেই, তবু সে কারো অধীন হবে না। আর জাপান চেয়েছিল সাম্রাজ্য। চীন দখল করতে পারলে তার সঙ্গে আর কেউ পেরে উঠ্‌বে না। তার সামাজ্য-ক্ষুধায় সমগ্র এশিয়া সন্ত্রস্ত হয়। চীনে জাপানে লড়াই হ'ল স্বাধীনতা ও সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ,—এ কথাটি তোমাদের বিশেষ করে মনে রাখ্‌তে হবে।

চীন যুগে যুগে পরাধীন হয়েছে। আবার পরাধীনতা-পাশ ছিন্ন করে স্বাধীনতাও সে অর্জ্জন করেছে। তার স্বাধীন মনোবৃত্তি কখনো লোপ পায় নি। মাঞ্চুবংশের উচ্ছেদ করে চীনারা বিগত ১৯১২ সালে স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। সেই আন্দোলনের মূলে ছিলেন ডাঃ সান-ইয়াৎ সেন। চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করে তিনি ব্যক্তি বিশেষের চিকিৎসা না করে জাতির চিকিৎসাতেই আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি বুঝেছিলেন, সব রোগের মূল হ'ল পরাধীনতা। তিনি মাঞ্চু-সম্রাটের বিরুদ্ধে বার বার বিদ্রোহ করেন। দ্বাদশ বারে তিনি দেশকে স্বাধীন করতে সক্ষম হন।

কিন্তু চীনের সমস্যা বড়ই জটিল। চীনাদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ

লেগেই ছিল। সান দেখ্‌লেন ঐক্য প্রতিষ্ঠা না হলে চীনের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, তাই চীন রিপাব্লিকের প্রেসিডেণ্ট পদ নিজে গ্রহণ না করে ভূতপূর্ব্ব মাঞ্চু-সম্রাটের সেনাপতি য়ুয়ান-শি-কাইকে দিয়ে দিলেন। এতেও কিন্তু বিশেষ সুবিধা হ'ল না। যাঁর দৌলতে য়ুয়ান এই উচ্চতম পদ লাভ করলেন তাঁর বিরুদ্ধেই তিনি ষড়যন্ত্র করতে লেগে গেলেন। এ সময় সান জাপানে চলে যান। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কুমিণ্টাংকে হীনবল করা ছিল য়ুয়ানের প্রধান উদ্দেশ্য। এর জন্য চেষ্টাও তিনি কম করেন নি। গত মহাসমরের মাঝখানে ১৯১৬ সালে য়ুয়ান মারা যান। সান-ইয়াৎ সেনের চীন পুনর্গঠনের কাজ কিন্তু পূর্ব্ববৎই চলতে লাগ্‌ল।

প্রথম মহাযুদ্ধে চীন মিত্রশক্তিদের যথাসাধ্য সাহায্য করেছিল, কিন্তু তার প্রতিদানে সে কিছুই পায় নি। পরে যখন রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সে এর সভ্য-শ্রেণী ভুক্ত হয়। উক্ত মহাযুদ্ধের সময়েই কিন্তু বুঝা গিয়েছিল মিত্রশক্তিদের সাহায্য করলেও চীনের ভবিষ্যৎ শুভ হবে না। জাপান তখন প্রাচ্যে খুবই প্রবল হয়ে উঠে; অদূর ভবিষ্যতে চীনের উপরই যে তার নজর পড়বে তা বুঝতেও বিশেষ বিলম্ব হ'ল না। যুদ্ধের সুযোগে জাপানের ব্যবসা-বাণিজ্য এশিয়ার সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধের পর ভের্সাই সন্ধিতে অনেকটা রাজ্যও সে পেয়ে গেল। ইউরোপ

তখন আত্মসংগঠনে ব্যস্ত, একারণ জাপানের শক্তিবৃদ্ধির দিকে প্রথমে কেউই নজর দিতে পারে নি। পরে এ নিয়ে খুবই আন্দোলন উপস্থিত হয়। চীনের উপর জাপানের যে কুমতলব ছিল তাও সকলে বুঝতে পারে। তাই ১৯২১-২২ সালে ওয়াশিংটনে ইউরোপ ও এশিয়ার শক্তিবর্গের মধ্যে যে-সব সন্ধি বা চুক্তি হয়েছিল সে-সবই জাপানের প্রতি লক্ষ্য রেখেই করা হয়। চুক্তিগুলির একটির নাম নব-শক্তি চুক্তি। চীনের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখে সকলেই সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবে এ-ই ছিল এ চুক্তিটির সার কথা। সকলেই এতে সায় দিলে, জাপানও এ চুক্তি মেনে নিতে তখন বাধ্য হ'ল।

এর পর সুরু হ'ল চীনের সংগঠনের যুগ। সান-ইয়াৎ সেন চিয়াং কাই-শেক ও অন্যান্য যোগ্য সহকর্ম্মীদের নিয়ে চীন-গঠন কার্য্য সুরু করলেন। চীন বিরাট দেশ, এর আয়তন যে কত বড়, সাধারণ চীনারা তার হয়ত খবরও রাখে না। চীনের এক দিক থেকে অন্য দিকে যেতে কি কষ্টই না পেতে হ'ত তাদের। বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বত, নদ-নদী, মরুভূমি সবই সেখানে রয়েছে। তোমরা শুনলে আশ্চর্য্য হবে, এখনো তিব্বতে যেতে হ'লে চীনাদের কলকাতা হয়েই যেতে হয়। এদের জনসংখ্যা খুব বেশী। বাইরের অংশ তিব্বত, মোঙ্গোলিয়া প্রভৃতি বাদ দিলেও খাস চীনের লোক সংখ্যা বিয়াল্লিশ কোটির কম

হবে না। এখানকার ধনসম্পদেরও হিসাব নিকাশ করা হয় নি, আর তা সম্ভবও নয়। তৈল, তুলা, চা, গম, লৌহ, স্বর্ণ, কয়লা, সেগুন কাঠ প্রভৃতি ভূমিজ ও খনিজ জিনিষে এদেশটি ভরা। আবহমান কাল ধরে বিদেশীরা, বিশেষ করে ইউরোপবাসীরা কেন যে এর উপর এত লোভ করেছে তার কারণ তোমরা নিশ্চই বুঝতে পারছ। ওয়াশিংটন চুক্তিগুলির সুযোগ নিয়ে সান-ইয়াৎ সেন এহেন চীনকে আবার আত্মস্থ ও শক্তিমান্ করবার জন্য চেষ্টা সুরু করলেন। স্বাধীনতা ও শক্তির মূল উৎসগুলি করায়ত্ত করে চীনকে আবার সবল সুস্থ করতে প্রয়াস পেলেন তিনি।

ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান, জার্ম্মানী, রুশিয়া প্রমুখ সাম্রাজ্য-বাদীদের চক্রান্ত চীন কখনো ভুলতে পারে নি। ১৮৯৪-৯৫ সালের চীন-জাপান যুদ্ধ, ১৯০০ সালের বক্সার বিদ্রোহ ও সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিহিংসাবৃত্তি চীনাদের প্রাণে শেলের মত বিঁধতে থাকে। প্রথমোক্ত যুদ্ধে চীন তার কোন কোন অংশ (ফরমোসা দ্বীপ, প্রভৃতি) হারায়। দ্বিতীয় বারে সাম্রাজ্য-বাদীরা চীনের ভিতরে সৈন্য মোতায়েন করবার অধিকার লাভ করে। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তার কাছ থেকে বন্দরগুলির কাষ্টম্‌স্ বা শুল্ক আদায় ও গ্রহণের ভার প্রাপ্ত হয় তারা। এর পর চীন রিপাব্লিকে পরিণত হ'ল, কিন্তু অন্তর্বিরোধ আগের মতই লেগে থাকায় এসবের কোন প্রতিকারই

হ’ল না। ওয়াশিংটন চুক্তির পর সান-ইয়াৎ সেন এদের হাত থেকে মুক্তি পাবার আশা পেলেন। ব্রিটিশ, ফরাসী বা জাপানী কাউকে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি, কাজেই সে-সব দেশ থেকে বিশেষজ্ঞও তিনি আমদানী করলেন না। তিনি মুখ ফেরালেন রুশিয়ার দিকে।

রুশিয়াও ইতিপূর্ব্বে চীনকে কম নাজেহাল করে নি, কিন্তু ও সময় তার কর্ম্মধারা একেবারে বদ্‌লে যায়। রুশ-সাম্রাজ্য উৎসন্ন হয়ে তখন সেখানে গণ-কর্ত্তৃত্বই প্রতিষ্ঠিত। সান স্বয়ং চীন পুনর্গঠনের জন্য যে নীতি প্রচার করেছিলেন রুশিয়ার সাম্যবাদের সঙ্গে তার অনেকটা মিল আছে। সান বললেন, জাতীয়তা, গণতন্ত্র ও আর্থিক সাম্য এই তিনটির ভিত্তিতে চীন-সমাজ পুনর্গঠিত করতে হবে। এ তিনটি কথার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। “বিদেশীদের আধিপত্যের সমস্ত সূত্র ছিন্ন করে দিয়ে চীনাদের জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।”—তিনি জাতীয়তার ব্যাখ্যা করলেন এইরূপ। “চীনের শাসন কার্য্য চলবে গণ-প্রতিনিধিদের দ্বারা পাশ্চাত্য দেশের আদর্শে। পরস্পরের ভিতর শক্তির তারতম্য থাক্‌লেও সকলেই দেশের সম্পদ যথাসম্ভব ভোগ করতে পাবে”—সান এ কথাও ঘোষণা করলেন। তাঁর এসব কাজে বিপ্লবী রুশদের কাছ থেকেই অধিকতর সাহায্য পাওয়া সম্ভব। তিনি সাহায্য পেলেনও। সান চিয়াং কাই-শেককে মস্কো পাঠিয়েছিলেন।

জোফে প্রমুখ রুশ বিশেষজ্ঞদের নিযুক্ত করে তিনি সৈন্য-বিভাগ, শাসন-বিভাগ প্রভৃতি গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত কর্‌তে লাগলেন। ক্যাণ্টনকে কেন্দ্র করেই এ-সব কার্য্য চল্‌ল। পরে নানকিঙে নূতন রাজধানী স্থাপিত হ'ল।

সানের প্রধান লক্ষ্য ছিল চীনের ঐক্য প্রতিষ্ঠা। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের স্ব-মতে আন্‌বার জন্য তিনি পিকিঙে গেলেন। কিন্তু এ কাজ বেশী দূর অগ্রসর হবার আগেই তিনি সেখানে মারা যান। চিয়াং কাই-শেক সানের বিশ্বস্ত সহকর্ম্মী ও চীনা-বাহিনীর অধ্যক্ষ। তিনিই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। কুমিণ্টাঙেরও নেতা হলেন চিয়াং।

একটি কথা কিন্তু এখনও তোমাদের বলা হয় নি। রুশ-বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে একদল চীনা যুবক তখনই চীনে সাম্যবাদ প্রবর্ত্তন করতে চেয়েছিল। এরা কুমিণ্টাঙের সভ্য থেকেও আর একটি দল গঠন করে। এ দলের নাম হ'ল কুং চাং টাং। সান যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন এ দল মাথা তুলতে পারে নি। তাঁর মৃত্যুর পরও কিছুকাল কুমিণ্টাঙে সকলে মিলে-মিশে কাজ করেছিল। কিন্তু দু'বছর পরেই এই দুই দলের ভিতরে হ'ল সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ। অনেকে মনে করেন, এ বিচ্ছেদ চীনজাতির পক্ষে ভীষণ অমঙ্গলের কারণ হয়েছিল।

১৯২৭ সালে এ বিচ্ছেদ ঘটে। এর পূর্ব্বেই চীনারা বিদেশীর অধিকার অনেকটা খর্ব্ব করতে পেরেছিল।

এ ব্যাপারে কিন্তু ১৯২৬ সালে ব্রিটেন ও চীনের ভিতর যুদ্ধ বাধবারও উপক্রম হয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আলাপ-আলোচনার ফলে কতকটা মীমাংসা হয়ে যায়। বিদেশীদের স্বার্থ প্রাচ্যের প্রায় সব দেশেই ছিল। ক্যাপিটুলেশনের কথা তোমাদের অনেক বার বলেছি। চীনে তা ছিল খুবই উৎকট রকমের। এক সাংহাই বাদে আর সকল জায়গা থেকেই এসব স্বার্থ এ সময়ে তুলে দেওয়া হ'য়।

সাম্যবাদীদের নেতা হলেন মাওৎ-সে তুং, আর নেশন্যালিষ্ট কুমিণ্টাং দলের নেতার নাম মার্শাল চিয়াং কাই-শেক। কুমিণ্টাং দলে অতঃপর চিয়াং কাই-শেকেরই প্রাধান্য হ'ল। সাম্যবাদীরা দক্ষিণ ও পশ্চিম চীনে আড্ডা গেড়ে সে-সব স্থলে সোভিয়েট বা সাম্যবাদমূলক রাষ্ট্র গঠন করতে লাগল। চীন কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষি ও কৃষকের উন্নতি সাধনই হ'ল সাম্যবাদীদের লক্ষ্য। কৃষককে ঋণমুক্ত ক'রে, আর নূতন নূতন যন্ত্র আমদানী ক'রে সমবেত ভাবে চাষবাস করবার উপায় করে দিল তারা। জনসাধারণের ভিতরে শিক্ষা-বিস্তারেরও ব্যবস্থা করা হ'ল। আত্মরক্ষার জন্য গরিলা বা খণ্ড যুদ্ধে এদের লোকজন শিক্ষিত হতে লাগ্ল।

কুমিণ্টাং হ'ল চীনের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। তাদের পক্ষে সাম্যবাদীদের বিরোধিতা বরদাস্ত করা সম্ভবপর হ'ল না। মার্শাল চিয়াং কাই-শেক বার বার এদের বিরুদ্ধে অভিযান

চালালেন। মোটামুটি বল্‌তে গেলে ১৯২৭ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত এই আত্মঘাতী অভিযান চলে।

জাপান যেন এতদিন ওৎ পেতেই ছিল। চীনের অন্তর্বিরোধের সুযোগ নিয়ে তার জিগীষা-বৃত্তি চরিতার্থ করতে অগ্রসর হ'ল। সে ১৯৩১ সালে চীনের কাছে থেকে কেড়ে নিলে মাঞ্চুরিয়া। ১৯৩৩ সালে নিয়ে নিলে জেহোল প্রদেশ। উত্তর চীনের পাঁচটি প্রদেশেও তার ইচ্ছামত শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হ'ল। লোকে তখন বলাবলি করতে লাগল, চিয়াং কাই-শেক সাম্যবাদীদের দমন করতে গিয়ে চীনকে শেষ পর্য্যন্ত জাপানের হাতেই তুলে দেবেন। একথা কিন্তু ঠিক নয়। চীনের উপর জাপানের দাবি যতই বাড়তে লাগল ততই সাম্যবাদী ও জাতীয়তাবাদী সকল দলের চীনারাই বুঝতে পারলে যে তাদের সত্যিকার শত্রু যদি কেউ থাকে তো ঐ জাপানীরা। ১৯৩৪ সালে চিয়াং কাই-শেক সেনাদলকে এ ভাবে উদ্বুদ্ধ করতে আরম্ভ করেন। জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে জাপান প্রতিরোধে অগ্রসর হবার ইচ্ছা ছিল তাঁর। সাম্যবাদীরাও ক্রমশঃ বুঝলে, নিজেদের আদর্শ মত যে-দেশ তারা গড়তে চাইছে তা যদি হাতছাড়াই হয়ে গেল তা হলে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে কিরূপে? কাজেই উভয় পক্ষের ভিতরই জাতীয় শত্রু জাপানের বিরুদ্ধে যুঝ্‌বার আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠল। পরে ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকারপক্ষীয়

সেনাপতি চ্যাং সুয়ে লিয়াং সিয়ান প্রদেশে নিজ অধ্যক্ষ চিয়াং কাই-শেককেই অকস্মাৎ আটক করে বসলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল —কি সাম্যবাদী কি জাতীয়তাবাদী সকল শ্রেণীর চীনাই যে তখন জাতির শত্রুর বিরুদ্ধে এক হয়ে লড়তে চাইছে তা তাঁর গোচরে আনা। চিয়াং মুক্তি পেলেন। বিশ্ববাসী বুঝতে পারলে, চীনে ঐক্য প্রতিষ্ঠার আর বেশী বিলম্ব নেই। জাপান কিন্তু শঙ্কিত হ'ল খুবই। বিরাট্ চীন যদি এক হয়ে তার বিরুদ্ধে জোট বাঁধতে পারে তা হলে তা বড়ই ভীষণ ব্যাপার হবে তার পক্ষে। তাই এর পর ছ'মাস যেতে না যেতেই তুচ্ছ অছিলা করে সে পিকিঙের নিকটে চীনাদের সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে দেয়!

জাপান চীনের তুলনায় খুবই ছোট দেশ। লোকসংখ্যাও চীনের এক পঞ্চমাংশ। কিন্তু তা হলে কি হয়? জগতে যে কটি বড় বড় শক্তি আছে জাপান তার মধ্যে একটি। জাপানের ধন-সম্পদ, শিল্প-বাণিজ্য, নৌবাহিনী, স্থলবাহিনী, ব্যোমবাহিনী যে-কোন বড় শক্তির সমান। চীনের শক্তি তার তুলনায় অতি সামান্য।

১৯১২ সালে রিপাব্লিক প্রতিষ্ঠা থেকে প্রথম বার বছর চীনের কেটে গেছে অন্তর্বিপ্লবে। তার পরে রুশ বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে সংগঠন কার্য্য আরম্ভ হ'ল বটে, কিন্তু সাম্যবাদী ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে বিরোধ সুরু হওয়ায় তা-ও আর বেশী দিন চলে নি। স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে চীনের

পক্ষে আত্ম-সংগঠন যে একান্ত আবশ্যক তা কিন্তু উভয় পক্ষই বুঝে ছিল। কাজেই উভয়েই নিজ নিজ আদর্শ মত চীনের উন্নতি সাধনে অগ্রসর হ'ল। এ সময়ের ভিতরে চীনের বহু স্থানে রাস্তা-ঘাট নির্ম্মিত হয়, রেলপথ স্থাপিত হয়, নদী থেকে খাল কেটে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। বিদেশীর অর্থে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যেরও উন্নতি হতে থাকে। সাম্যবাদী দলে রুশ আর জাতীয়তাবাদী দলে জার্ম্মান সমরনীতি-বিশেষজ্ঞ নিয়োজিত হয়ে স্থলবাহিনী ও বিমানবাহিনী পুনর্গঠিত করা হ'ল, নৌবাহিনীরও পত্তন হ'ল এ সময়। কিন্তু চীনের মত বিশাল দেশের আত্মরক্ষার পক্ষে, আর জাপানের মত প্রবল শত্রুর সঙ্গে যুঝবার পক্ষে এ আয়োজন খুবই সামান্য। তবে দু'দল একত্র হয়ে চেষ্টা করলে কয়েক বছরের মধ্যেই শক্তিশালী হতে পারত। জাপান চীনাদের সে অবসর দিলে না।

চীন-জাপান লড়াই বহু বছর ধরে চল্‌লেও জাপান কিন্তু একে লড়াই বলে স্বীকারই করে নি! চীনারা আবার একটা জাতি হ'ল কবে যে, তাদের স্বীকার করে নিয়ে একে লড়াই বল্‌তে হবে! চীনের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা নিজ নিজ ইচ্ছা মত চলে, কেউ রুশীয় সাম্যবাদের প্রশ্রয় দেয়, কেউ প্রশ্রয় দেয় ব্রিটিশ ও মার্কিন ধনতন্ত্রের। এ দুয়ের কোনটাই জাপানের কাম্য নয়। সকলকে বর্জ্জন করে চীনারা তার কথামত

চলবে এ-ই সে সর্ব্বান্তঃকরণে চেয়েছিল। চীনারা কিন্তু তার এ কামনা পূরণ করতে রাজী নয়। তাই তারা তাদের যৎসামান্য অস্ত্র-শস্ত্র নিয়েই প্রবল জাপানের বিরুদ্ধে লড়তে সুরু করে। যদি চীনের একটি মানচিত্র তোমরা পাও, তা হ'লে দেখতে পাবে, উত্তর-চীন প্রায় সবটা, আর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-চীনের সমুদ্রতীরবর্ত্তী অনেকটা, অর্থাৎ চীনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জাপানীদের অধিকারে! চীনের ধনসম্পদের বেশীর ভাগই জাপানীদের হাতে চলে যায়। এতেও কিন্তু চীনারা দমে যায় নি। নানকিং, হ্যাঙ্কৌ ধ্বংসের পর পশ্চিম চীনের চুংকিঙে চীনারা রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গেছে। জাপানীরা যত যায়গা দখল করেছে তার বেশীর ভাগই করেছে এরোপ্লেন থেকে বোমা ছুঁড়ে। চীনারা যে-সব স্থান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়, সে-সবই তারা পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে যায়। আবার এসব স্থলে এখনও যে সকল চীনা বসবাস করছে তারা কিন্তু সুযোগ পেলে জাপানীদেরই ঘাড় মটকাতে কসুর করে নি। চীনারা গরিলা যুদ্ধ করে জাপানী সেনাদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

রুশিয়া বাদে কোন বিদেশীই ইতিপূর্ব্বে চীনকে কোন রকম সাহায্য করে নি। পরে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করে। চীনের উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ সব দিকেই জাপান আগ্‌লে থাকায় চীনারা তখন রেঙ্গুন থেকে নব-নির্ম্মিত ব্রহ্ম-চীন পথেই অস্ত্র-শস্ত্র আমদানী করাতে বাধ্য হয়। ন' মাসের

ভিতর চীনারা তের শ' মাইল দীর্ঘ রাস্তা তৈরী করে এখানে! চীনের এ স্বাধীনতা সংগ্রামে পরাধীন জাতিমাত্রেই তাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানায়। ভারতবাসীদের সাহায্য করবার ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। তবু তারা এই যুদ্ধের মধ্যেই চিকিৎসক ও ঔষধপত্র পাঠায় আহত চীনাদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য।

ইতিপূর্ব্বেই কিছুকাল যাবৎ চীনের যুদ্ধ পরিচালনায় কয়েকটি কারণে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। জাপানের চাপে ব্রহ্ম-চীন পথে ১৯৪০ সালের জুলাই মাস থেকে ব্রিটেন চীনে যুদ্ধের রসদপত্র প্রেরণ বন্ধ করে। সোভিয়েট রুশিয়া ১৯৪১ সালের প্রথমে জাপানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়। একারণ সেখান থেকে রণসম্ভার আমদানীর আশা বিলুপ্ত হয়।

কিন্তু গত ১৯৪১, ৭ই ডিসেম্বর জাপান ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হবার পর চীন-জাপান যুদ্ধের এক নূতন পর্ব্ব সুরু হয়। চীন তখন স্বভাবতঃই মিত্রশক্তিদের সঙ্গে যোগ দেয়। ব্রহ্ম-যুদ্ধকালে সুশিক্ষিত চীনাবাহিনী মিত্রশক্তিদের বিশেষ সাহায্য করে। এই যুদ্ধের মধ্যেই মিত্রশক্তিদের পক্ষে সেনাপতি ওয়াভেল রাজধানী চুংকিং গিয়ে মার্শাল চিয়াং কাই-শেকের সঙ্গে যুদ্ধপরিচালনা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন।

১৯৪২ সালের প্রথমে মার্শাল চিয়াং কাই-শেক ও মাদাম চিয়াং কাই-শেক কয়েকজন প্রধান পরামর্শদাতা সঙ্গে নিয়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন। এক পক্ষে বড়লাট লিনলিথগো

ও সরকারী প্রধান কর্ম্মচারীগণ এবং অপর পক্ষে মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আবুলকালাম আজাদ ও পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু প্রমুখ নেতৃবর্গের সঙ্গে তাঁরা দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা করেন। জাপানকে কিরূপে সার্থকভাবে প্রতিরোধ করা যায় এই ছিল আলোচনার বিষয়। আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা না পেলে ভারতবাসীর পক্ষে মিত্রশক্তিদের আশানুরূপ সাহায্য করা যে খুবই কঠিন তাও তিনি জেনে নিয়েছেন।

জাপান ব্রহ্ম-অভিযান শেষ করে পশ্চিম প্রান্ত থেকে চীনের মধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু চীনাবাহিনী তাকে বাধা দিতে অনেকটা সক্ষম হয়। চীনের জীবন-মরণ সমস্যার মধ্যেও সংগঠনমূলক কার্য্যের কথা সে ভোলে নি। আমাদের দেশের যে-সব স্থানে কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হয় সে-সব স্থানে সরকারী ভাবে মাদক-দ্রব্য বর্জ্জনের উদ্যোগ-আয়োজন চলেছিল। চীনদেশে এ চেষ্টা কয়েক বছর আগেই সুরু হয়। লোকে এখনও চীনাদের আফিমখোর বলে। চীন-সরকার আইন করে আফিম সেবন একেবারে বন্ধ করে দিয়েছেন। সেখানে আফিম-সেবীর শাস্তি হ'ল প্রাণদণ্ড! চীনারা এ বিপদের ভিতরেও কিন্তু বিদ্যাভ্যাস বন্ধ করে নি। জাপানীদের অত্যাচারের ভয়ে যত দূরেই সরে যাক্ না কেন, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, গ্রন্থাগার সবই তারা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যায়! তবে চীনের অভ্যন্তরেও ইদানীং আর্থিক দুর্গতি চরমে উঠেছিল। কোন

কোন অঞ্চল দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে জনশূন্য হবার উপক্রম হয়। তবু স্বাধীন চীনের মেরুদণ্ড বরাবর দৃঢ়ই ছিল।

যুদ্ধের মধ্যে চীনের শাসন ব্যাপারে কতকটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। তথাপি কি ভাবে ওদেশ শাসিত হচ্ছে তাও তোমরা নিশ্চয়ই জান্‌তে চাইবে। তোমরা একাধিক বার 'কুমিণ্টাং' কথাটির উল্লেখ পেয়েছ। সান-ইয়াৎ-সেন এর প্রতিষ্ঠাতা। আমাদের দেশে যেমন কংগ্রেস, চীনে তেমনি কুমিণ্টাং। বর্ত্তমানে কুমিণ্টাংই চীনে সর্ব্বেসর্ব্বা—এর নির্দ্দেশ মতই সেখানে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। মন্ত্রীসভা এরই নির্দ্দেশে গঠিত হয়, এবং দায়ীও থাকে এরই কাছে। কুমিণ্টাং ছাড়া অন্য কোন দল সেখানে স্বীকৃত হয় না। যুদ্ধের মধ্যে সাম্যবাদীরাও এই কুমিণ্টাং দলভুক্ত হয়ে দেশ-শাসন, দেশ-রক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে সহযোগিতা করে। চিয়াং কাই-শেকের প্রতিটি কার্য্যেই সহায় ছিলেন সহধর্ম্মিণী মাদাম চিয়াং কাই-শেক।

মিত্রপক্ষে সোভিয়েট রুশিয়াও ছিল। কিন্তু জাপানের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ থাকায় তার নিকট হতে চীনারা কোন সাহায্যই পায় নি। তাই মিত্রশক্তিভুক্ত ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরই তাদের একান্ত নির্ভর করতে হয়েছে। কায়রো শহরে যে মিত্রপক্ষ-নেতৃবর্গের বৈঠক হয় তাতে চীনের পক্ষে মার্শাল চিয়াং কাই-শেক যোগ দিয়েছিলেন। এ বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল

প্রাচ্যে জাপান-শক্তি ব্যাহত করার উপায় নির্দ্ধারণ করা। এতে কিন্তু তখন রুশিয়া যোগ দেয় নি।

চীনের এক বৃহৎ অংশ জাপানের তাঁবেদারি রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এই অংশের কর্ণধার হন কুমিণ্টাঙের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ওয়াং চেং ওয়ে। তিনি চীন সংগঠনে প্রতীচ্য রাষ্ট্রবর্গের সাহায্য অপেক্ষা জাপানের সাহায্যই অধিকতর কাম্য মনে করতেন।

মিত্রশক্তির নিকট জাপান সম্প্রতি নতি স্বীকার করেছে। এর ফলে দীর্ঘ ন' বছর পরে চীন-জাপান যুদ্ধও শেষ হয়েছে। পট্‌স্‌ডাম বৈঠকের প্রস্তাব অনুসারে জাপান চীনের অধিকৃত যাবতীয় অংশও ছেড়ে দিতে বাধ্য।

চীন থেকে জাপান হাত গুটোবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেখানে সাম্যবাদী ও জাতীয়তাবাদী দলের মধ্যে বিবাদ বাধবার সম্ভাবনা হয়। চিয়াং কাই-শেক যুদ্ধের মধ্যেই শাসনভার ত্যাগ করে শুধু সেনাধ্যক্ষ পদেই নিজেকে বাহাল রেখেছিলেন। তবে শাসনকার্য্যে তাঁর মতই যে প্রবল তা বলা বাহুল্য। সোভিয়েট রুশিয়া ইদানীং চীন পুনর্গঠনে সরকার পক্ষকেই সাহায্য করবে বলে জানিয়েছে! এর ফলে সাম্যবাদীরা জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে আপোষ-রফা করতে উৎসুক হয়েছে। তাঁরা একযোগে কাজ করতে সম্মত হবেন বলে মনে হয়। কি সাম্যবাদী কি জাতীয়তা-বাদী জাপানের পতনে সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌ছেন।

—দুই—

জাপান

তোমরা জাপানের মানচিত্র নিশ্চয় দেখে থাকবে। কতকগুলি ছোট ছোট দ্বীপের সমষ্টি হ'ল এই জাপান। এই ছোট দেশটির প্রতাপেই সকলে সন্ত্রস্ত হয়েছিল।

জাপান বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল বহু শতাব্দী পূর্ব্বেই। বাইরের কোন লোক দেশ-পর্য্যটন, ব্যবসা-বাণিজ্য, বসবাস এক কথায় কোন কিছুর জন্যই সেখানে যেতে পারত না। সে নিজের ভিতরই নিজে আবদ্ধ হয়ে ছিল। অবশেষে, কমোডোর পেরি নামে একজন আমেরিকান নাবিক গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি বহু সাধ্যসাধনা করে জাপানীদের অনুমতি দিতে রাজি করালেন সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করবার জন্য। তারপরে ১৮৬৭ সালে সম্রাট মেইজী আইন করে সব বাধা-নিষেধ তুলে নিলেন। বাইরের জগতের সঙ্গে জাপানীদের পুরোপুরি সংযোগ ঘটল এ সময় থেকে। জাপানের অভিজাত সম্প্রদায়ের নাম সামুরাই। তারাই পূর্ব্বে দেশ শাসন করত। রাজা ছিলেন তাদের হাতের পুতুল। কিন্তু মেইজী ছিলেন জবরদস্ত সম্রাট। তিনি সামন্ততন্ত্র তুলে দিলেন, সামুরাইদের ক্ষমতাও হ্রাস পেল।

তিনি শাসন ব্যবস্থা নিজ ইচ্ছামত ঠিক করে নিলেন। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নানা বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য জাপানী যুবকগণকে ইউরোপ, আমেরিকায় পাঠান হ'ল। পাশ্চাত্যের শিক্ষা দীক্ষা তাদের প্রাণে নব বল ও নূতন আশার সঞ্চার করতে লাগ্‌ল।

১৮৮৯ সালে জাপানে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়,—ঠিক পাশ্চাত্যের আদর্শে। সম্রাট, প্রিভি-কাউন্সিল, কেবিনেট বা মন্ত্রীসভা, ইম্পিরিয়াল ডায়েট বা প্রতিনিধি-পরিষদ (প্রতিনিধি-সভা ও লর্ড সভা) ঠিক বিলাতের অনুকরণেই এসব করা হয়েছে। লর্ড সভার সদস্য-সংখ্যা ৪০৪ জন। রাজ-পরিবার ও অভিজাত সম্প্রদায় থেকে এ সভার সভ্য মনোনীত হয়। প্রতিনিধিসভা বিলাতের হাউস অফ্ কমন্সেরই মত। এর সদস্য সংখ্যা ৪৬৬ জন। প্রতি এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার লোকেতে একজন করে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়। পঁচিশ বছর বা তদূর্দ্ধ সকল পুরুষই নির্ব্বাচনে যোগ দিতে পারেন। ত্রিশ বছরের কম হলে কেউ এ সভার সভ্য হতে পারেন না। প্রতিনিধিসভায় বিভিন্ন দলও রয়েছে। এদের ভিতর দুটি দল প্রধান, নাম সিজুকি ও মিন্‌সিটো। বিলাতে যেমন কন্‌সারভেটিভ বা রক্ষণশীল ও লিবার‍্যাল বা উদার-নৈতিক দল আছে এও ঠিক তেমনি। এ দুটি দলই কমবেশী পার্লামেণ্টারী বা গণতন্ত্রমূলক শাসনের পক্ষপাতী।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা তোমাদের স্মরণ রাখ্‌তে হবে। পাশ্চাত্যের আদর্শে শাসন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হলেও সম্রাট কিন্তু ক্রমে তাঁর পূর্ব্ব প্রভাবই ফিরে পেয়েছেন। জাপানের সৈন্যদল কখনও গণতন্ত্রমূলক শাসন-পদ্ধতি পছন্দ করে নি। তারা আবহমান কাল থেকেই প্রত্যক্ষভাবে সম্রাটের অধীন। অন্য কারো কর্তৃত্ব স্বীকার করতে তারা রাজি নয়। সৈন্যদলকে কেন্দ্র করে জাপানে একদল উগ্র জাতীয়তাবাদীর উত্থান হয়েছে। জেনারেল আরাকি হলেন এ দলের নেতা। তিনি 'কোডো' নামে এ দলের একরকম দর্শন প্রণয়ন করেছেন। এদের বিশ্বাস, "জাপান সম্রাট, জাপান জাতি, জাপানের জলবায়ু, তরুলতা, পাহাড়-পর্ব্বত, সকলই পরম পবিত্র বস্তু; জাপানীরা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জাতি,—এ বিশ্ব তাদের পদতলে একদিন গড়াগড়ি যাবে"! আবার জাপানের পৌরাণিক কাহিনীকে তারা সত্য দর্শন বলে প্রচার করছে। "জাপ-সম্রাট সূর্য্য দেবতা আমাতেরাসুরের সাক্ষাৎ বংশধর! প্রায় আড়াই হাজার বছর যাবৎ এ বংশ জাপানে রাজত্ব করছে।" ধর্ম্মেও কিন্তু জাপ-সম্রাটের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। অনেকের ধারণা, জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত বলে সম্রাটও একজন বৌদ্ধ। এ কিন্তু সত্য নয়। রাজ-পরিবারের ধর্ম্ম আলাদা। 'শিণ্টো' হলেন তাদের দেবতা। জাপানের পুরাণশাস্ত্রে এর বিবরণ দেওয়া আছে। উগ্র জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধির

সঙ্গে সঙ্গে জাপ-সম্রাটের কুলজীরও খোঁজ নিচ্ছে আজ জাপানীরা !

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হবার সঙ্গেই জাপানীদের উগ্র মতবাদের বিকাশ হতে থাকে। এর প্রথম পরিচয় পাই ১৮৯৪-৯৫ সালের চীন-জাপান যুদ্ধে। জাপান চীনের সংস্পর্শে এসে অতীত যুগে সভ্য স্তরে উঠেছিল। চীনা ভাষাই জাপানীদের ভাষা। চীনের সাহিত্য সংস্কৃতিতেই তারা পুষ্ট ও বর্দ্ধিত, কাজেই এদিক দিয়ে চীন-জাপান ছিল অভিন্ন। পরে অন্যান্য বিদেশীর মতই জাপান কিন্তু চীনের প্রতি দুর্ব্যবহার করতে থাকে। চীনের ধন সম্পদের কথা আগেই তোমরা শুনেছ। তার অনৈক্য ও শক্তিহীনতা ক্রমে বিদেশীদের প্রলুব্ধ করলে তার ধন সম্পদের দিকে। বিদেশীরা নিজ নিজ ঘাঁটিও সেখানে আগ্‌লাতে লাগ্‌ল। জাপান তখন সবেমাত্র পাশ্চাত্য ধরণে যুদ্ধবিদ্যা শিখে শক্তি বাড়াতে সুরু করেছে। ঐ সময়ে (১৮৯৪-১৮৯৫) সে-ও চীনের ধন সম্পদে ভাগ বসাতে চইলে। সে যুদ্ধে জয়ীও হ'ল। কিন্তু আশানুরূপ কিছুই পেলে না। চীনে তখন ব্রিটিশ, ফরাসী, জার্ম্মান ও রুশ আড্ডা গেড়ে বসেছে। এদের ভিতর জাপানের মাথা গলানো খুবই কঠিন ব্যাপার। তবে দক্ষিণ চীনের নিকটবর্ত্তী ফরমোসা দ্বীপটি সে এবারে পেয়ে গেল।

অতঃপর জাপানের কোপ পড়ল চীনের ঐ বিদেশীদের উপর। পাশ্চাত্য রীতিতে তার রণশক্তি দ্রুত বাড়ান

দরকার,—যদি ওখানে তাকে কিছু করে নিতে হয়। স্থল-বাহিনী ও নৌ-বাহিনী সুনিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা চল্‌ল। বিদেশে জাপানীদের পাঠান হ'ল যুদ্ধবিদ্যা শেখাবার জন্য। এড্‌মিরাল তোগোর নাম তোমরা হয়ত শুনেছ। তোগো লণ্ডনে নৌ-বিদ্যা শিখেছিলেন। ১৯০৪ সালে পোর্ট আর্থারের যুদ্ধে জাপানীরা যে রুশকে হারিয়ে দিতে সমক্ষ হয়েছিল তা তাঁরই রণচাতুর্য্যের বলে, বল্‌তে হবে। এ যুদ্ধে রুশরা হেরে যাওয়ায় লোকে বুঝতে পার্‌লে জাপানীরা এত অল্প সময়ের মধ্যে কতখানি শক্তিশালী হয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে তখন রুশিয়াকে খুব একটি বড় শক্তি বলে সকলে জান্‌ত। তাকে হারিয়ে দেওয়া তো কম কথা নয়! ঐ যুদ্ধের ফলে জাপান প্রাচ্যে প্রধানতম শক্তি হয়ে উঠ্‌ল। সে মাঞ্চুরিয়া রেলপথের কর্তৃত্ব রুশের হাত থেকে কেড়ে নিলে। রুশিয়াকে হারাতে ব্রিটেন নাকি জাপানকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল—একথাটি এখন তেমন প্রকাশ নেই। জাপানের কূটনীতিরও তারিফ করতে হবে তা বলে। ব্রিটেন রুশিয়াকে শত্রু বলে মনে করত অনেকদিন আগে থেকে। তাই জাপান ১৯০২ সালে রুশ-শত্রু ব্রিটেনের সঙ্গে সন্ধি করে নেয়!

জাপানের শক্তিসাধনা পুরোদমেই চল্‌ল। ১৯১০ সালে সে কোরিয়া অধিকার করে নিলে—বিদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যও বাড়াতে চেষ্টা করলে। যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুত করতে হলে যে-সব কাঁচা মাল আবশ্যক, তা জাপানে উৎপন্ন হয় না—অধিকাংশই বিদেশ

থেকে আমদানী করতে হয়। তেল, লোহা, রবার বিদেশ থেকে আমদানী না হলে তার সব কাজই প্রায় অচল হয়ে পড়ে। ইংরেজের সঙ্গে সে তখন সন্ধিবদ্ধ। ১৯০২ সাল থেকে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত এ সন্ধি বলবৎ ছিল। কাজেই প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে দশ-বার বছর প্রাচ্যে তার বাণিজ্য ও শক্তি নির্বিঘ্নে প্রসার লাভ করতে পেরেছিল। আর ব্রিটিশের আওতায় ছিল বলে অন্য কেউ তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে ভরসা পায় নি।

এর পর বাধ্‌ল মহাযুদ্ধ। মহাযুদ্ধ হ'ল যেন জাপানের পক্ষে আশীর্ব্বাদ! জার্ম্মানীকে ঠেকাবার জন্য ইউরোপে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রুশিয়া যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল; যুক্তরাষ্ট্রও পরে এসে এদের সঙ্গে যোগ দেয়। এখানে একটি কথা তোমাদের মনে রাখতে হবে। পোর্ট আর্থারের যুদ্ধের পর রুশ শক্তি অনেকটা খর্ব্ব হয়। তার দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, বিশেষ করে ভারতবর্ষ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাওয়ায় ইংরেজ তার সঙ্গেও সন্ধি করে নিলে। ইংরেজের বন্ধু হ'ল জাপান। জাপান রুশিয়াকে কোন দিনই দু'চক্ষে দেখতে পারে নি। অতঃপর কিন্তু তাকে রুশিয়ার বন্ধু রূপেই চলতে হ'ল। গত মহাসমরে প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর ও পূর্ব্ব সাম্রাজ্যগুলি রক্ষার ভার পড়ল জাপানের উপর। জাপান নিষ্ঠার সঙ্গে এ কাজ সমাধা করলে। বলা বাহুল্য, এর ফলে প্রাচ্যে জাপানের শক্তি প্রবল হ'য়ে উঠে। এশিয়ার

ব্যবসা-বাণিজ্য তারই একচেটিয়া হবার উপক্রম হয়। তার যে রাজ্য-ক্ষুধা প্রবল তা প্রকাশ হয়ে পড়ল এই মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি। তখন সে চীনের উপর তার একুশটি দাবি পেশ করে বস্‌লে! আর্থিক, রাজনৈতিক সর্ব্বপ্রকারে চীনকে করায়ত্ত করবার ইচ্ছা ছিল তার। মিত্রশক্তিরা কিন্তু এতে একযোগে বাধা দিলে। শেষে জাপান তার দাবি ত্যাগ করতে বাধ্য হ'ল। যুদ্ধের পরে জাপান প্রশান্ত মহাসাগরে বিষুব রেখার উত্তর দিকস্থ জার্ম্মানীর উপনিবেশগুলি সবই পেয়ে গেল!

এত দিন মিত্রশক্তিরা অন্য কথা ভাব্‌বার অবসর পায় নি। যুদ্ধের পর তারা, বিশেষ করে ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র বুঝলে এশিয়ায় জাপানের শক্তি যেমন দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে তাতে তাকে সময় থাক্‌তে ঠেকাতে না পারলে পরে বাগমানান কঠিন হবে। চীন প্রসঙ্গে তোমাদের ওয়াশিংটন চুক্তিগুলির কথা বলেছি। এ সব চুক্তির উদ্দেশ্যই ছিল জাপানের শক্তির রাশ টেনে ধরা। জাপান তখন ঐ চুক্তিগুলিতে রাজি হয়। হয়ত জাপানের পক্ষে তখন এতে সম্মত না হয়ে উপায়ও ছিল না। ব্রিটেন ও জাপানের ভিতর বিশ বছর যাবৎ যে সন্ধি বলবৎ ছিল এর পর তা বাতিল হয়ে গেল।

ব্রিটিশ, ফরাসী ও মার্কিন উপনিবেশগুলিতে জাপানীদের ব্যবসা-বাণিজ্যে বিঘ্ন ঘটাবার চেষ্টা চল্‌ল এর পর থেকে।

ও-সব স্থলে প্রবেশের পক্ষেও নানা বাধা-নিষেধ সৃষ্টি করা হ'ল। বলা বাহুল্য, এ সময়ে খাস আমেরিকায়ও জাপানীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে আইন পাস করা হয়।

ব্রিটেন এত কাল ছিল সমুদ্রের একচ্ছত্র অধিপতি। যুদ্ধের পরে কিন্তু তার এ দাবি টিক্‌ল না। একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অন্য দিকে জাপান তার সঙ্গে আড়ি দিয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল। ওয়াশিংটনে বসে রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে যে নৌ-চুক্তি বিধিবদ্ধ হ'ল তাতে ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে নৌবহরের অনুপাত ঠিক হয় ৫ঃ ৫ঃ ৩। অর্থাৎ ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যেকেরই নৌবহর হবে সমান সমান; আর এদের যদি থাকে পাঁচখানা করে জাহাজ, তবে জাপানের থাক্‌বে তিন খানা। জাপান এ প্রস্তাবেও রাজি হয়েছিল। কিন্তু পুনরায় যখন ১৯৩০ সালে লণ্ডনে বসে এ অনুপাত বাহাল করা হ'ল তখন জাপানীদের ভিতর খুবই বিক্ষোভ দেখা দিল। এর মধ্যেই জাপানের প্রধান মন্ত্রী জাপানী আততায়ীদের হস্তে নিহত হলেন!

এর পর থেকে ধীরে ধীরে জাপানে সৈন্যতন্ত্রেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। আগে বলেছি, জাপ-বাহিনী স্বয়ং সম্রাটের অধীন, মন্ত্রীসভার বা পার্লামেণ্টের কোন তোয়াক্কা তারা রাখে না। চীনকে নিজেদের মতে চালান জাপানী মাত্রেরই অভিপ্রায়। চারদিকে যখন জাপানীদের ব্যবসা

বাণিজ্যের হানি ঘটাবার চেষ্টা চলে তখন তারা চীনের উপরই নির্ভর করলে বেশী করে। জাপানের সৈন্যতন্ত্র কিন্তু অধীর হয়ে উঠ্‌ল। চীনকে তারা একেবারে গ্রাস করে ফেলতে চাইলে। এ বিষয়ে তারা আরো জোর পেল, যখন দেশবাসীকে বোঝাতে পারলে যে, এখনই চীনে কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হলে তাদের আজন্ম-বিরোধী রুশিয়া সেখানে নিজ শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে থাকবে। ইটালী ও জার্ম্মানীর মত জাপানও সোভিয়েট রুশিয়াকে শত্রু হিসাবে সম্মুখে রেখে সব কাজ হাসিল করতে চেষ্টা করত।

১৯৩১ সালে মাঞ্চুরিয়া অভিযান, ১৯৩৩ সালে জেহোল অধিকার ও অন্যান্য বহু কাজই সৈন্যতন্ত্র নিজ দায়িত্বে করেছিল! এর পর জাপান নৌচুক্তি অস্বীকার করে নৌবহর বাড়াতে লাগ্‌ল। তাদের যুদ্ধব্যয় ভয়ানক রকম বেড়ে গেল। জাপান মন্ত্রীসভা কিন্তু সৈন্যতন্ত্রের অভিপ্রায় অগ্রাহ্য করে গত ১৯৩৬ সালের বজেটে যুদ্ধখাতে কম করে টাকা ধরতে চেয়েছিলেন। এর পরিণাম কি ভীষণ হয়েছিল জান? সৈন্য-দল জোট করে এক রাত্রিতেই পাঁচ-সাত জন মন্ত্রীকে খুন করে ফেলে! সৈন্যদের কারো কারোর অবশ্য কঠোর শাস্তি হয়েছিল। কিন্তু এই একটি ঘটনা থেকেই তোমরা বুঝতে পার সৈন্যতন্ত্র জাপানে কিরূপ প্রবল হয়ে পড়েছে। ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে জাপান জার্ম্মানীর সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হয়। উভয়েই স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা

করলে যে সাম্যবাদী রুশিয়ার তারা ঘোরতর শত্রু। একে তারা ঠেকাবেই। তখন কেউ ভাবে নি যে, এর পরেই জাপান চীনের উপরও চড়াও হবে। কিন্তু হ'ল তাই-ই, ছ' মাস যেতে না যেতেই তুচ্ছ ওজুহাতে জাপান চীন আক্রমণ করে বসল।

জাপানে সৈন্যতন্ত্রই প্রবল। সিজুকাই ও মিনসিটো দলের ক্ষমতা ঢের হ্রাস পায়। চীন প্রসঙ্গে তোমাদের বলেছি, প্রায় ন' বছর ধরে চীন-জাপান লড়াই চলে। চীনের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি, শহর, বন্দর ও রেলপথ জাপানীদের কবলে আসে। তবুও কিন্তু চীনাদের সায়েস্তা করা সম্ভব হয় নি। জাতীয় জীবনে জটিল অবস্থার উদ্ভব হলেও জাপানে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল নামে একটি সভা আহ্বানের ব্যবস্থা আছে। দেশের পদস্থ, গণ্যমান্য, দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এতে আহূত হয়ে থাকেন। জাপানের ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে চার বার মাত্র এ কাউন্সিল বসেছিল। এই চীন-জাপান লড়াইয়ের মধ্যে পঞ্চম বার এই সভা আহ্বান করা হয়। এখানে একটি কথা তোমাদের বলে রাখি। চীন-জাপান লড়াইয়ের খবর খুব কমই কিন্তু জাপানে প্রকাশ করতে দেওয়া হ'ত। যে-সব স্থলে জাপানীরা জয়লাভ করে বা চীনাদের হটিয়ে দিতে সক্ষম হয় তারই মাত্র উল্লেখ থাকত ওখানকার সংবাদপত্রে। এ হিসাবে চীন-জাপান

লড়াইয়ের কথা জাপানীদের চেয়ে আমরাই কিন্তু বেশী জানতাম। ক্রমে আন্তর্জাতিক অবস্থা জটিল হয়ে উঠে। ইউরোপে সমরানল জ্বলে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই জাপানীরা তাড়াতাড়ি চীন-জয় কার্য্য সমাধা করতে চেয়েছিল। কুমিণ্টাঙের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ওয়াং চেং ওয়েকে দিয়ে তারা একটা তাঁবেদার চীন-রাষ্ট্রও গঠন করে নেয়।

জাপান যখন পোর্ট আর্থারের যুদ্ধে বিরাট্ শক্তি রুশিয়াকে হারিয়ে দিলে তখন এশিয়াবাসীরা আশ্বস্ত হয়েছিল। তখন তাদের আশা হয়, জাপানের মত তারাও একদিন ইউরোপের বিভিন্ন জাতিগুলিকে নিরস্ত করতে পারবে। তারা তখন জাপানকে অভিনন্দন করলে এশিয়ার 'নবারুণ' বলে। চীন-নেতা ডক্টর সান-ইয়াৎ সেন প্রচার করেছিলেন, 'এশিয়া হবে এশিয়াবাসীর জন্য'। তাঁর এই স্বপ্ন কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হবে জাপানের সাহায্যে,—সাধারণে তখন এই কথাই ভেবেছিল। জাপানীরাও মুখে অবশ্য এই কথাই বলে। কিন্তু তাদের সাম্রাজ্য-ক্ষুধা যেমন ভাবে আত্মপ্রকাশ করে তাতে এশিয়াবাসীরা নিতান্তই শঙ্কান্বিত হয়।

চীনে বিদেশীদের, বিশেষ করে ব্রিটিশের প্রতি জাপানের ব্যবহার পাশ্চাত্য শক্তিবর্গকে কতকটা সজাগ করে দেয়। তারা নিজ অধিকৃত অঞ্চলে জাপানী ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর অতিরিক্ত শুল্কাদি স্থাপন করে নানারকম

বাধা সৃষ্টি করতে থাকে। ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের সঙ্গে সকল রকম বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন করে।

জাপান পূর্ব্ব থেকেই জার্ম্মানী ও ইটালী এই দুইটি অক্ষশক্তির সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ ছিল। ১৯৪০ সালে ২৭শে সেপ্টেম্বর সে নূতন করে এদের সঙ্গে একটি সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। তখন থেকে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে অতিরিক্ত সন্দেহের চোখে দেখ্‌তে আরম্ভ করে এবং তার প্রতিটি কার্য্যের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখ্‌তে থাকে। বন্ধু জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে মারাত্মক সংগ্রামে লিপ্ত সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে জাপান কিন্তু এক অনাক্রমণাত্মক চুক্তি করে। এই চুক্তি বলে সোভিয়েট রুশিয়া মিত্রশক্তিবর্গের দলভুক্ত হলেও জাপানের বিরুদ্ধে সে বা তার বিরুদ্ধে জাপান বহু দিন অস্ত্রধারণ করে নি।

জাপান এইরূপে আটঘাট বেঁধে ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর কোনরকম পূর্ব্বাভাষ না দিয়েই যুগপৎ ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের অধিকৃত অঞ্চল আক্রমণ করে। মার্কিন রাজনীতিকরা তাঁর একার্য্যকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে আখ্যা দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র তখন জাপান, জার্ম্মানী, ইটালী প্রমুখ অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ও তদবধি ব্রিটেনের সহযোগে নানা স্থানে লড়তে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এইরূপ যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য হওয়ায় মহাত্মা গান্ধী দুঃখ করে বলেন যে, জগতে

এমন একটিও বড় শক্তি আর রইল না যার মধ্যস্থতায় এই আত্মঘাতী সংগ্রামের একদিন অবসান হতে পারত।

প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন নৌবহরে সুরক্ষিত হাওয়াই দ্বীপের পার্ল বন্দর আক্রমণেই জাপানের এই অভিযান সুরু। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর হতে ১৯৪২ সালের মে মাসের মধ্যে জাপান ব্রিটিশ ও মার্কিনের রাজ্যগুলিতে অভিযান চালিয়ে এইসব উল্লেখযোগ্য অঞ্চল অধিকার করে নেয়—পার্ল বন্দর, গুয়াম, হংকং, ওয়েক দ্বীপ, মার্কিনের ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, সারাবাক, যবদ্বীপ, বলীদ্বীপ প্রভৃতি পূর্ব্ব-ভারতীয় ওলন্দাজ সাম্রাজ্য, সিঙ্গাপুর, মালয়, ব্রহ্মদেশ ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। ফ্রান্সের পতনের পর হতে জাপান ইন্দো-চীনকে নিজ প্রয়োজনে লাগাতে থাকে। এই ইন্দো-চীন ও শ্যামকে ভিত্তি করেই সে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর ও ব্রহ্মদেশে বিজয়-অভিযান চালাতে সক্ষম হয়।

ব্রহ্মদেশ বিজয়ের পর বঙ্গোপসাগরে জাপান আধিপত্য বিস্তার করে। সিংহলে, বিশাখাপত্তনে, মাদ্রাজে, কলিকাতায়, চট্টগ্রামে ও আসামের কোন কোন অঞ্চলে বিমান থেকে জাপানীরা বোমাবর্ষণ করে। তারা মণিপুর পর্য্যন্ত আক্রমণ চালায়। অষ্ট্রেলিয়ায়ও তাদের বোমা বর্ষিত হয়।

গত ১৯৪৪ সালেই যুদ্ধের কিন্তু মোড় ফিরে যায়। জাপানের শত্রু ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র। এ দুটি রাষ্ট্রই তিন বৎসরের মধ্যে যুদ্ধ বিমানপোত ও রণ-সম্ভারে জার্ম্মানী ও জাপান উভয়কেই

ছাপিয়ে উঠে। ইউরোপে যেমন জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান চলে জাপানের বিরুদ্ধেও সেইরূপ অভিযান আরম্ভ হয়। জাপান ব্রহ্মদেশের অধিকাংশ অঞ্চল থেকেই বিতাড়িত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ফিলিপাইনের দিকে অভিযান চালিয়ে তা পুনরধিকার করে; প্রশান্ত মহাসাগরের সলোমন ও অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জেও নিজ শক্তি দৃঢ় করে নেয়। এই সব অঞ্চল থেকে জাপানের উপর অবিরাম বোমা বর্ষিত হতে থাকে। এত ক্ষতি সত্ত্বেও জাপান অনমনীয় ছিল। কিন্তু এই সময়কার দুইটি ঘটনা তাকে বড়ই বিচলিত করে। সোভিয়েট রুশিয়া মেয়াদ ফুরোবার পূর্ব্বেই গত ৯ই আগষ্ট (১৯৪৫) জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে। দ্বিতীয় ব্যাপার হ'ল— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-বাহিনী কর্ত্তৃক জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে মারাত্মক আণবিক বোমা (Atom Bomb) বর্ষণ। এই বোমা দ্বারা প্রথমটি একবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। উভয় স্থলে প্রায় দুই লক্ষ নরনারী শিশু মারা যায়। এর সম্মুখে যুদ্ধ পরিচালনা বিফল দেখে জাপ-সম্রাট মিত্রশক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। সম্প্রতি মার্কিন সেনাপতি নৌবাহিনী স্থলবাহিনী ও বিমানবাহিনী সহযোগে জাপানে গমন করে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি করে নিয়েছেন, জাপানের উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করাই তাঁর অভিপ্রায়। ওদিকে সোভিয়েট রুশিয়াও মাঞ্চুরিয়ার দিকে কতকটা অংশ দখল করে নিয়েছে।

—তিন—

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

তোমরা ভূগোল নিশ্চয়ই পড়ছ। তাতে দেখবে ভূমণ্ডলকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে—পূর্ব্ব গোলার্দ্ধ ও পশ্চিম গোলার্দ্ধ। শেষোক্তটিকে আবার 'নূতন জগৎ'-ও বলা হয়। আমেরিকাই এই পশ্চিম গোলার্দ্ধ বা নূতন জগৎ। আগে লোকে এ দেশটির কথা বড় একটা জানত না। কলম্বস ১৪৯২ সালে ভারতবর্ষের দিকে রওনা হয়ে ভ্রমক্রমে এই নূতন দেশ আমেরিকায় গিয়ে উপস্থিত হন! এজন্য তিনি ও তাঁর পরবর্ত্তী লোকেরা এর নাম দিয়েছিলেন 'ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ'। অবশ্য এখন এমন কতকগুলি পুরাতন মন্দির, মূর্ত্তি ও অন্যান্য জিনিষ সেখানে আবিষ্কৃত হয়েছে যার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে কোন অতীত যুগে ভারতবর্ষ তথা এশিয়ার সঙ্গে এর যোগস্থাপন হয়েছিল।

বর্ত্তমানে কিন্তু এশিয়ার সঙ্গে তার যোগ খুবই। এ সম্বন্ধে বলবার আগে তোমাদের আর একটি কথা বলে রাখছি। আমেরিকা বলতে আমরা সাধারণতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বুঝি। আসলে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র আমেরিকার একটি অংশ মাত্র। আমেরিকা দু'টি মহাদেশে বিভক্ত—উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা। যুক্তরাষ্ট্র এই উত্তর আমেরিকার ভিতরকার একটি অঞ্চল। এ ছাড়া উত্তর আমেরিকায় নাম

করা দেশ রয়েছে কানাডা ও মেক্সিকো। দক্ষিণ আমেরিকায় আছে এগারটি রিপাব্লিক বা গণতন্ত্র। এ সবেরই কিন্তু নেতৃত্ব করছে এই যুক্তরাষ্ট্র। আমেরিকা বলতে যে সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্রকে বুঝায় তাও বোধ হয় এই কারণেই।

এশিয়ার সমস্ত আন্তর্জাতিক ব্যাপারেই যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ যোগ। সে না হলে এখানকার কোন সমস্যারই যেন সমাধান হয় না। কোন কোন বিষয়ে তাকে অগ্রণী হতে বা নেতৃত্ব করতেও দেখা গেছে। এর কারণ কি? ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জাপানের মত তারও বিশেষ স্বার্থ রয়েছে পূর্ব্ব এশিয়ায় ও প্রশান্ত মহাসাগরে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ তার অধিকারে ছিল বহুদিন। চীনের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে তার স্বার্থ ঢের। জাপানের সময় তোমরা শুনেছ যুক্তরাষ্ট্রের কমোডোর পেরী প্রথম জাপানকে রাজী করান বিদেশীর সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে। যুক্তরাষ্ট্রের সমৃদ্ধি এশিয়ার বাজারের উপর কম নির্ভর করে নি। তাই জাপানের মাঞ্চুরিয়া অধিকার ও চীন-জাপান লড়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে খুবই উদ্বিগ্ন করে তোলে। ফিলিপাইনে ও হাওয়াই দ্বীপে সে নৌঘাঁটি শক্ত করে স্থাপন করেছিল এই কারণেই। পার্ল বন্দর এই হাওয়াই দ্বীপেরই একটি প্রধান বন্দর।

এশিয়ার নানা সমস্যায় যুক্তরাষ্ট্র যেমন ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে, ইউরোপীয় ব্যাপারগুলিতে কিন্তু সে এতকাল তেমন

জড়িত হয়ে পড়তে চায় নি। এর একটা কারণ অবশ্য এই যে, এশিয়ার মত ইউরোপে তার স্বার্থ তেমন নিবিড় হয়ে নেই। তবে ইউরোপে যদি কোন রাষ্ট্র প্রবল হয়ে উঠে, তা'হলে অন্যান্যের মত তারও ভাবনা বেড়ে যায়। এর ভিতর তার আত্মরক্ষার প্রশ্ন যুক্ত রয়েছে বলেই, বোধ হয়, এমনি হয়। গত মহাসমরে সে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে যোগ দেয় জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে। আমেরিকাবাসীদের কিন্তু আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিয়ে দিয়েই তবে যুদ্ধে নামান সম্ভব হয়েছিল। যুদ্ধ শেষে যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা আবশ্যক মনে করে নি। রাষ্ট্রসংঘের সভ্যও সে হ'ল না। তার মতে সে দৃঢ় রয়েছে বরাবর।

ইদানীং কিন্তু আবার জার্ম্মানীর ক্ষমতাধিক্যে যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। তখন একথা শোনা যায় যে, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের স্বাধীনতা বিপন্ন হলে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতাও বিপন্ন হবে। অবশ্য কেউই অস্বীকার করবেন না যে, জার্ম্মানীর শক্তি এসময় যে রকম দ্রুত গতিতে বেড়ে চলে তাতে শুধু ছোট রাষ্ট্রগুলিরই নয়, বড় রাষ্ট্রগুলিরও ভয়ের কারণ ছিল যথেষ্ট। আর জার্ম্মানীকে যদি বাধা দিতে হয় তবে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের প্রয়োজন হবেই। গত মহাসমরের চেয়ে এবারে এর সাহায্যের প্রয়োজন আরও বেশী। কারণ এবারে প্রথমেই জার্ম্মানী ও সোভিয়েট রুশিয়া সম্মিলিত ভাবে আসরে

নামে ! ইউরোপ ও এশিয়া দুটি মহাদেশই যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য পাবার জন্য তখন লালায়িত হয়।

কলম্বসের আমেরিকা গমনের পর হতে ইউরোপের নানা দেশ থেকে লোকজন গিয়ে এখানে বাসা বাঁধতে থাকে। আদিম অধিবাসী রেড-ইণ্ডিয়ানরা সুসভ্য ইউরোপীয়দের সম্মুখে দাঁড়াতে পারলে না, আস্তে আস্তে সরে পড়ল তারা। এখন তারা প্রায় লোপ পেতে বসেছে ! ইউরোপ থেকে কারা গিয়েছিল জান ? মধ্যযুগে ধর্ম্ম নিয়ে বড়ই বাড়াবাড়ি চলেছিল ওখানে। খ্রীষ্টানদের ভিতর দুটি দলের কথাই আমরা বিশেষ করে জানি—রোমান কাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট। এ ছাড়া আরও বহু দল রয়েছে এদের ভিতর। এক দল আর এক দলের উপর অকথ্য অত্যাচার করত। এদের মধ্যে পিউরিটান বা গোড়া নীতিবাদী এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। প্রোটেষ্টাণ্ট দল থেকেই তাদের উদ্ভব, কিন্তু রোমান কাথলিক বা প্রোটেষ্টাণ্ট কেউই তাদের দেখতে পারত না। বিভিন্ন দেশেই এ দল দেখা দিয়েছিল। তারা শেষ পর্য্যন্ত নূতন দেশ আমেরিকাতেই আশ্রয় খুঁজে নিলে। পরে অনেকেই অবশ্য সেখানে গিয়েছে, কিন্তু এরাই প্রথমে গিয়ে আমেরিকাকে শ্বেতাঙ্গদের বাসোপযোগী করে তুলে। এ কম কৃতিত্বের কথা নয়। আবার, এদের ভিতর অধিকাংশ হ'ল ইংরেজ। হিসাব করে দেখা গেছে, শতকরা ছেচল্লিশ জন গিয়েছে ইংলণ্ড থেকে, বাকী চুয়ান্ন জন গিয়েছে ইউরোপের

বিভিন্ন দেশ থেকে। কাজেই ইংরেজ ও ইংরেজীর প্রাধান্য আজ সেখানে। যদিও ইংরেজ বলে আজ কেউ নিজেদের পরিচয় দেয় না, তথাপি যুক্তরাষ্ট্র ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতিকেই বরণ করে নিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইংরেজ অ-ইংরেজ সকল অধিবাসীই প্রভু ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করে সেযুগে স্বাধীনতা অর্জ্জন করে। ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই তেরটি প্রদেশ কংগ্রেসে মিলিত হয়ে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। তারপর ইংরেজের সঙ্গে লড়াই চলতে থাকে। ছ' বছর পরে ১৭৮২ সালের নবেম্বর মাসে ব্রিটেন আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। পর বছর উভয়ের ভিতর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে সন্ধি হয়। স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-তন্ত্র স্থির হয় এর চার বছর পরে। এর পর থেকে আজ পর্য্যন্ত যদিও একুশ বার শাসন-তন্ত্র সংশোধিত হয়েছে, তথাপি মূলতঃ এ আগের মতই আছে।

তোমাদের আগে বলেছি, ফ্রান্সের ন্যায় যুক্তরাষ্ট্রও একটি ষোল আনা গণতন্ত্র। এখানকার প্রেসিডেণ্ট বা সভাপতি প্রতি চার বছর অন্তর গণভোটে নির্ব্বাচিত হন। কংগ্রেসের মত অনুসারে মন্ত্রীদের সাহায্যে তিনি দেশ শাসন করেন। কংগ্রেসের দুটি বিভাগ, সেনেট ও হাউস্ অফ্ রিপ্রেজেণ্টেটিভস্ বা প্রতিনিধি পরিষদ। যুক্তরাষ্ট্র ক্রমে আটচল্লিশটি ষ্টেট বা রাজ্যে বিভক্ত হয়েছে। এরা প্রত্যেকে

দু' জন করে প্রতিনিধি সেনেটে পাঠায় ছ' বছরের জন্য। সেনেটের সদস্য সংখ্যা মোট ছিয়ানব্বই জন। ত্রিশ বছরের বা তদূর্দ্ধ বয়সী লোকেরা সেনেটের সভ্য হতে পারেন। প্রতিনিধি পরিষদে মোট সদস্য সংখ্যা চার শ' পয়ত্রিশ। এদের আয়ুষ্কাল মাত্র দু' বছর। প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজ নিজ নিয়ম অনুসারে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য গণভোট দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়ে পরিষদে আসেন। যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা খুব বেশী, তথাপি কংগ্রেসের মত না নিয়ে তিনি কিছুই করতে পারেন না, বা নিজ দায়িত্বে কিছু করলেও পরে এর সম্মতি নিতে হয় তাঁকে। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি সহজ হবে। প্রেসিডেণ্ট উইলসন ছিলেন রাষ্ট্রসংঘ গঠনের মূলে; কিন্তু কংগ্রেস সম্মতি না দেওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র এর সভ্য হতে পারে নি!

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে দু'টি প্রধান ঘটনা তোমাদের মনে রাখ্তে হবে। প্রথমটি হ'ল মন্‌রো 'ডক্‌ট্রিন' বা মন্‌রো নীতি! ১৮১৭ থেকে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জেম্‌স্ মন্‌রো আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তাঁর আমলে এই নীতি প্রবর্ত্তিত হয় বলে এর ঐ নাম দেওয়া হয়েছে। এর মর্ম্ম হ'ল এই যে, বিদেশ থেকে কেউ এসে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার কোন স্বাধীন অঞ্চলই আক্রমণ বা ভোগদখল করতে পারবে না। যদি কেউ এরূপ করতে চেষ্টা করে তা হলে যুক্তরাষ্ট্র নিজ স্বাধীনতা বিপন্ন বলে মনে করবে এবং সমস্ত

শক্তি দিয়ে তার বিরুদ্ধে লড়বে। ও সময় আমেরিকার, বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি সবেমাত্র স্বাধীন হয়েছে। অন্য কেউ এসে তাদের উপর চড়াও হলে তারা নিজ নিজ স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখ্‌তে পারত না। যুক্তরাষ্ট্র ওরূপ আইন পাস করে এদের সুবিধা করে দিলে, নিজেও বৃহৎ ভূখণ্ডের নেতৃত্ব লাভ করলে। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে পেরু রাজ্যের লিমা শহরে যে নিখিল-আমেরিকান সম্মেলন হয় তাতে তার এই নেতৃত্ব সকলেই নূতন করে মেনে নেয়। তখন সকলেই প্রতিজ্ঞা করে যে, বৈদেশিক শত্রুর বিরুদ্ধে তারা যুক্ত-রাষ্ট্রের সঙ্গে একযোগে লড়বে। মন্‌রো নীতি যাতে লঙ্ঘিত না হয় তার প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের শ্যেন দৃষ্টি। ইউরোপীয় যুদ্ধে সে বার বার যোগদান করে এই নীতিকে অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার জন্যই।

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে আর একটি প্রধান কথা আমেরিকার নিগ্রো বা কাফ্রীদের স্বাধীনতা দান। নিগ্রোদের উপর অত্যাচার এখনও চলছে সেখানে, কিন্তু আগে যা অত্যাচার হয়ে গেছে তার তুলনায় এ কিছুই নয়। আমেরিকার তাজা জমি চাষ-আবাদের জন্য এই কালা আদমী নিগ্রোদের ক্রয় করে নিয়ে যাওয়া হ'ত আফ্রিকা থেকে। তারা ছিল এক কথায় ক্রীতদাস। তোমরা বুকার টি ওয়াশিংটনের 'আত্মজীবনী'র কথা হয়ত শুনেছ। এ আত্মজীবনীর একখানি ভাল অনুবাদ বই বাংলায় আছে। ওয়াশিংটন নিজে নিগ্রো, তাই এ বই থেকে

তাদের সে সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কিছু তোমরা জানতে পারবে। প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কন (১৮৬১-১৮৬৫) এদের স্বাধীনতা দিয়ে দেন। এ নিয়ে আমেরিকায় ভীষণ গৃহযুদ্ধ সুরু হয়। লিঙ্কন কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করলেন। কিন্তু শেষে আততায়ীর হাতে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দেন। নিগ্রোরা তখন থেকে স্বাধীনভাবে বসবাস করছে।

গত দেড় শ' বছরের অবিরাম চেষ্টায় যুক্তরাষ্ট্র আজ ধন-সম্পদে, কৃষি-শিল্পে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিক্ষা-সভ্যতায় জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। সে সুদূরে পড়ে আছে বটে, তথাপি আজ যখনই যেখানে কোন সমস্যা দেখা দেয় অমনি তার ডাক পড়ে। প্রথম মহাযুদ্ধে আমেরিকা যোগ না দিলে মিত্রশক্তির পক্ষে জয়লাভ করা খুবই কঠিন হ'ত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও আবার তারই ডাক পড়ে ইউরোপ ও এশিয়ায়।

গত মহাযুদ্ধে কিছুদিন অর্থাৎ ভের্সাই সন্ধি পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। তারপর সে আবার হাত গুটিয়ে নিলে। ইউরোপীয় ব্যাপারে সে আর যোগ রাখ্‌বে না বল্‌লে। কিন্তু রাজনীতির দিক দিয়ে না হোক, অর্থনীতির দিক দিয়েও কিন্তু তাকে কতকটা সংস্রব রাখ্‌তে হয়েছিল। গত মহাযুদ্ধে সে বিস্তর টাকা ঢেলেছে ইউরোপের বাজারে—সে-সব আদায়ের উপায় তো দেখ্‌তে হবে?

অর্থনীতি বিষয়ে যে-সব আন্তর্জাতিক কমিটি বা সম্মেলন হ'ল তাতে সে যোগ না দিয়ে পারলে না। আবার বিভিন্ন দেশকে টাকাও সে ধার দিতে লাগ্‌ল। কিন্তু এর বেশী আর সে এগোল না।

এশিয়ার ব্যাপারে কিন্তু সে মোটেই উদাসীন রইল না। গত যুদ্ধের সময়ে ও পরে জাপান এখানে খুবই প্রবল হয়ে উঠেছিল। তাকে না ঠেকালে আমেরিকার স্বার্থ বিশেষ ভাবে বিপন্ন হবার সম্ভাবনা। এজন্য প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং (১৯২১-১৯২৩) ওয়াশিংটনে একটি সম্মেলন আহ্বান করলেন। এখানে যে-সব চুক্তি হয় তার আভাষ তোমাদের আগেই দিয়েছি। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে চতুঃশক্তি চুক্তি, নবশক্তি চুক্তি, নৌ-চুক্তি প্রভৃতি কতকগুলি চুক্তি হয়ে যায়। চুক্তিগুলি আলোচনা করলে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে—চীনকে স্বাধীন রেখে সেখানে সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ হাসিল করতে চেয়েছিল; আর এশিয়ায় ও প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান যাতে অবাধে নিজ শক্তি বাড়িয়ে না নিতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছিল।

এর পরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভীষণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। বাজার মন্দার কথা তোমরা অনেকবার শুনেছ। ১৯২৯ সালের পর থেকে এ ব্যাপার সুরু হয়। বাজার মন্দা হবার কারণ কি? আর জগতের সব দেশেই-বা একই সময়

এ দেখা দিলে কেন? এর অনেক কারণ আছে। একটির কথাই এখানে তোমাদের বলছি। আজকাল চলাচলের সুব্যবস্থা হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যেরও খুব সুবিধা হয়েছে। এক দেশের মাল অন্য দেশে অনায়াসে যেতে পারে। কিন্তু ঐ সময় নিজ নিজ উন্নতির জন্য অনেকগুলি দেশ স্বয়ং-পূর্ণ হতে চায়, অর্থাৎ নিজ নিজ দেশের তৈরী মাল ব্যবহার করবে, অন্যের মাল কিনবে না এরূপ সংকল্প করে। মুখে বল্‌লেই তো আর লোক শুনবে না—তাই প্রত্যেকটি দেশ আইন করে বিদেশাগত জিনিষের উপর উচ্চ হারে শুল্ক বসাতে লাগ্‌ল। এতে করে বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতিবেগ ভীষণ ভাবে বাধা পেলে। যদি এমন হ'ত যে, প্রত্যেক দেশই সব বিষয়ে নিজের উপরে নির্ভর করে থাক্‌তে পারত তাহলে এর ফল এত বিষময় হ'ত না। কিন্তু ব্যাপার তো আর সে রকম হবার নয়। সকলকেই যে সকলের উপর নির্ভর করতে হয়। পাল্লা দিয়ে শুল্ক বাড়াবার ফলে প্রত্যেকেরই মালপত্র আটক পড়ে গেল। প্রথম প্রথম নানা রকম সভাসমিতি হয়েছিল এর প্রতিরোধের জন্য, কিন্তু সকলেই নাচার। কাজেই প্রত্যেক দেশে মালপত্র জমে স্তূপীকৃত হয়ে উঠ্‌ল! ব্যবসা নাই, অর্থ আসবে কোথা থেকে? ভীষণ অর্থসঙ্কট উপস্থিত হ'ল সর্ব্বত্র।

এর ফলে অনেকে অনেক রকমে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল। যুক্তরাষ্ট্রও ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল খুবই। গত ১৯৩৩ সালে প্রেসিডেণ্ট হয়ে

ফ্রাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্ট এর প্রতিকার করতে চেষ্টা করলেন নূতন ভাবে। যুক্তরাষ্ট্র কৃষি বা শিল্প বিষয়ে কারো মুখাপেক্ষী নয়। তিনি এসব সুনিয়ন্ত্রিত করে লোকের দুঃখ কষ্ট দূর করতে চেষ্টা করলেন। আমেরিকায় এক দিকে আছে প্রাচুর্য্য আর এক দিকে আছে দৈন্য। দামে সস্তা হবে—এ আশঙ্কায় কত বাড়তি গম যে সেখানে পুড়িয়ে ফেলা হয় বা কত দুধ যে ঢেলে ফেলা হয় তার ইয়ত্তা নেই! রুজভেল্ট এরূপ বিসদৃশ ব্যাপারের সংস্কারে মন দিলেন। জমির মালিক ও চাষীর ভিতরে নূতন বন্দোবস্ত তিনি করে দিয়েছেন—যাতে দু'জনেই লাভবান হতে পারে! কারখানার মালিক ও শ্রমিকদের ভিতরেও নানা ব্যবস্থা হয়েছে—মালিকের লাভের অঙ্ক খানিকটা কমিয়ে দিয়ে শ্রমিকের মুখে দুমুঠো অন্নদেবার জন্য। শ্রমিকেরা এখন সংঘবদ্ধ হয়েছে। তাদের কাজের সময় ও বেতনের হারও অনেকটা নিয়ন্ত্রিত। ধনিকেরা কিন্তু রুজভেল্টের উপর খুশী ছিল না, তথাপি বিশেষ উচ্চবাচ্য করতে পারে নি। রুজভেল্ট এতটা জনপ্রিয় যে, তিনি তৃতীয় বার বিপুল ভোটাধিক্যে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। ১৯৪৪ সালে চতুর্থ বার তিনি প্রেসিডেণ্ট হলেন। এ কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব।

পাশ্চাত্য দেশের কথা আলোচনার সময় একটি কথা তোমাদের বিশেষ করে মনে রাখতে হবে। ওখানকার অধিবাসীদের জীবন-ধারণের মাপকাঠি আমাদের চেয়ে ঢের

উঁচু। কাজেই এদেশের আর ওখানকার দারিদ্র্যের মধ্যে পার্থক্যও ঢের।

গত কয়েক বছর যাবৎ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আর একটা বিষয়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়—প্রবল জাতিগুলি দুর্ব্বল জাতিদের নানাভাবে নাস্তানাবুদ করতে থাকে। কারো কারো মতে—পৃথিবীর সব কাঁচা মাল কয়েকটি জাতি আগ্‌লে রেখেছে বলেই এ ব্যাপার আরম্ভ হয়েছে। যারা শক্তিমান্, স্বাভাবিক ভাবে তাদের শক্তি বিকাশের পথ না পেয়ে এরূপ অস্বাভাবিক উপায় নাকি তারা অবলম্বন করে! যুক্তরাষ্ট্র এ সব ব্যাপারে নেই বলে একটা নিরপেক্ষতামূলক আইন পাস করিয়ে নিয়েছিল। এ আইনের মর্ম্ম এই যে, আমেরিকার বাইরে আক্রান্ত বা আক্রমণকারী কাউকে সে সাহায্য করবে না। পরে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এরূপ করতে বাধ্য হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রই তখন নিজ দায়িত্বে নগদ মূল্যে সেখান থেকে অস্ত্রশস্ত্র কিন্‌তে পারত।

এর পর থেকে জাপানের যুদ্ধারম্ভ পর্য্যন্ত তিন বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চেষ্ট বসে থাকে নি। ফাসি-বাদ কি নাৎসি-বাদ কোনটাই তার পছন্দ নয়। সে খাঁটি গণতন্ত্রের উপাসক। এজন্য যেখানেই গণতন্ত্র বিপন্ন সেখানেই সাহায্যার্থ তার হস্ত প্রসারিত হয়। দ্বিতীয় মহাসমরে ইউরোপে জার্ম্মানীর বিজয়-অভিযানে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নেতৃত্বে মার্কিনরা নানাভাবে

ব্রিটেনকে সাহায্য করতে অগ্রসর হয়। অক্ষশক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করেও, যুদ্ধরত ব্রিটেনকে তারা প্রচুর অর্থ ও সমরোপকরণ জুগিয়েছিল। 'লীজ এণ্ড লেণ্ড বিল' বা 'ঋণ ও ইজারা আইন' দ্বারা মার্কিন সরকার এই সাহায্য বিশেষ করে সম্ভব করে দিয়েছিল। প্রাচ্যে জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্যই তার সঙ্গে তারা সমগ্র বাণিজ্যিক আদান-প্রদান বন্ধ করে দেয়। যুক্তরাষ্ট্র এইরূপে ভাবী অনর্থের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে।

পূর্ব্বেই জাপান প্রসঙ্গে বলেছি, ব্রিটিশ ও মার্কিন রাজ্যগুলি অতর্কিতে আক্রান্ত হলেই যুক্তরাষ্ট্রও জাপান ও অন্যান্য অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। প্রাচ্যে ব্রিটেনের মত যুক্তরাষ্ট্রও বহু অঞ্চল হারায় বটে, কিন্তু সকল রণক্ষেত্রেই সে নিজ সেনাবাহিনী ও রণসম্ভার প্রেরণ করে ব্রিটিশের সঙ্গে একযোগে লড়েছে। ব্রিটেনে বিস্তর মার্কিন সেনা জড় করানো হয়েছিল। মিত্রশক্তিবর্গের মূল লক্ষ্য ছিল জার্ম্মানী। জার্ম্মানীকে কোনক্রমে নিরস্ত করতে পারলেই জগতে পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং গণতন্ত্রও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হতে পারবে এই ছিল তাদের বিশ্বাস।

ভারতবর্ষে এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলেও বিস্তর মার্কিন-বাহিনী ও রণসম্ভার প্রেরিত হয়। মার্কিন সেনারা অন্যান্য মিত্র সেনার সঙ্গে একযোগে দক্ষিণ ইউরোপের ইটালীতে ও এশিয়ার নানা স্থানে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। উত্তর আফ্রিকা

থেকে জার্ম্মান-বাহিনী যে হটে আসতে বাধ্য হয় তাব মূলে
ছিল মার্কিন-বাহিনীর কৃতিত্ব।

রুশিয়া, ব্রিটেন, চীন প্রমুখ মিত্রশক্তিবর্গেব সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের
একই উদ্দেশ্যে সমবকার্য্য পবিচালনাব কথা ইতিপূর্ব্বেই ব
হয়েছে। ইতিমধ্যে রুজভেল্ট অকস্মাৎ মাবা গেলেন। তাঁ
স্থলাভিষিক্ত হলেন তাঁরই সহকাবী সভাপতি ট্রুম্যান। এব
ইউবোপে জার্ম্মানীব পতন ঘটেছে। পববর্ত্তী তিন মাসেব মধ্যে
জাপানেবও পতন ঘটে। এ উভয ব্যাপাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের
কৃতিত্ব খুব। সমস্ত আন্তর্জাতিক নীতি লঙ্ঘন কবে আণবিক
বোমাব সাহায্যেই যুক্তবাষ্ট্র জাপানেব পতন ঘটায়। এদিকে
পুনর্গঠনমূলক কার্য্যেও সে নেতৃত্ব গ্রহণ কবেছে। যুক্তরাষ্ট্রের
আহ্বানে ক্যালিফর্নিয়াব প্রধান শহব সান ফ্রান্সিস্কো
মিত্রপক্ষেব অন্তর্ভুক্ত পঞ্চাশটি বাষ্ট্র সম্মিলিত হয়ে জগতের
ভাবী পুনর্গঠন সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা কবে নিয়েছেন। জগ
সুখ শান্তি প্রতিষ্ঠা কল্পে একটি শক্তিশালী সংঘ প্রতিষ্ঠাব ব
হয় এখানে। যুদ্ধোত্তবকালীন জার্ম্মানীর নিয়ন্ত্রণেও যুক্তরাষ্ট্র বি
শক্তি প্রযোগ কবছে। জাপানের উপবও তার পূর্ণ ক
স্থাপনেব সম্ভাবনা। যুদ্ধেব মধ্যে ভারতবাসীদের
মার্কিনীদের নানা বিষয়ে যোগাযোগ সংঘটিত হয়েছে।
ফল ভারতবাসীর পক্ষে হয়ত শুভই হবে।